চতুর্থ অধ্যায়

রহুচণ্ডালের হাড় : বিকল্প বাস্তব, বিকল্প গ্রন্থনা

উত্তরবঙ্গের যাযাবর গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনির প্রবহমান চিত্র 'রহুচণ্ডালের হাড়'। কাহিনির শুরুতেই সংকেত রয়েছে। শরিবা আর তার নানি লুবিনির মধ্যে গভীর সখ্য ছিল। লুবিনি শারিবাকে অতীতের কথা বলে। অন্ধকার স্যাঁতসাঁতে ঘরে লুবিনি গল্প বলে : অজ্ঞাত দেশের কথা, ঘর্ঘরা নদীর কথা। বলতে বলতে অতীতের দুঃখের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাযাবর সম্প্রদায়ে নিজস্ব কোন দেশ হয় না। দেশ-জল-মাটি কোন কিছুই তাদের নিজের নয় বহমান নদীর স্রোতের মতো তারা একস্থান থেকে আর এক স্থানে বয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় নায়ক চরিত্র উপেনের মতো সমস্ত ভুবন তার নিজের, তার আপন। উপেন যেমন তার জমি, সমাজ ফিরে পেতে চেয়েছে তেমনি রহুচণ্ডালের হাড়-এর যাবাবরেরাও স্থিতি পেতে চেয়েছে। সমাজের মূল স্রোতে মিশতে চেয়েছে। ধর্মীয় সমাজকে আঁকড়ে ধরে সামাজিক জীবন আশা করেছে। কিন্তু সহজে তা পায় না।

কাহিনির কথক চরিত্র লুবিনি, শরিবাকে গল্প শোনাতে গিয়ে নষ্টালজিক হয়ে পড়ে। সেই অজ্ঞাত 'দ্যাশের ভাষা' সে বলে—

> *"সি দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজেই বিসোরণ হোই গিছে।"* [১]

বাজিকর কেন তাদের ভাষা ভুলে গেছে? সে ভাষা তাদের নিজের নয় কেন? তাহলে এই যাযাবর মানুষগুলির রাষ্ট্রিক পরিচয় কি? ওরা সব কি পরিচয়হীন মানুষ? এই মৌলিক প্রশ্ন যেমন উপন্যাসের, তেমনি পাঠকেরও।

আমরা তারই আলোচনায় এগিয়ে যাব।

'রহুচণ্ডালের হাড়'- রীতিমতো বাস্তব সমস্যার নিরিখে লেখা একটি উপন্যাস। অভিজিৎ সেন সমাজের এক নগ্ন বাস্তব সত্যকে আমাদের সামনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কাম্য গন্তব্যের দিকে। তাঁর কাহিনির মধ্যে যেমন বাস্তবতা আছে, তেমনি বাঁধন আছে আর আছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

যাযাবরেরা স্বভাবতই 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' বা 'ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার' প্রতি আস্থাবান। রহুচণ্ডালের হাড় দিয়ে যে ভেলকি ভান্‌মতির খেল, সেই অনিশ্চয় আর বিস্ময়ে মজে থাকে পীতেম বাজিকর। কোনো এক নিশ্চত ঘরে ঠাঁই নিলে কেমন হয়? এই প্রশ্ন পীতেমকে মনে মনে ভাবিয়ে তোলে। শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে বাস্তুভিটার টান আর সে অস্বীকার করতে পারে না। মনে হয় এবার থিতু হওয়ার সময় এসেছে। নারী শিশু অর্থাৎ সংসার, সম্পত্তি বংশ পরম্পরার বাঁধনে মনকে বাঁধন দেওয়া যাক। ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম কোনো কিছুই বাজিকরের নিজস্ব নয়।

> *"এলা বুলি বাজিকর দ্যাশ দ্যাশ ঘুর‍্যে শিখা লয়। যেথার ঘুরে সিথাকার বুলি ধরে লয়, সেথাকার ধরম করম শিখালয়। সিটা তার আপন বুলিতে মিশাল করে লয়। বাজিকরের আপন কুনো ধরম নাই।"*[২]

রহুচণ্ডালের বংশধরদের যে যাযাবর বৃত্তি তাতে তো কোনো নিশ্চিত নির্ধারিত চিহ্ন ধারণ করা বাজিকরদের সম্ভব নয়। সামাজিক কোনো পরিকাঠামোয় দাঁড়িয়ে পুঁজির আধিপত্য নির্মিত ইতিহাসের বোঝা বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। পীতেমের জীবনে বেশ কিছু সামাজিক সমস্যা ও জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল।

রহুর যাযাবর বংশের ভার সে আর বইতে পারছিল না। সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম, দলবদ্ধ সামাজিক জীবনের স্বপ্ন দেখে পীতেম। যাযাবরের জীবন অভিশপ্ত মনে হয় পীতেমের। পীতেমের পরিবার, সংসার, ঘর, সমাজ, রাষ্ট্রের দরকার। এই মৌলিক চাহিদা পীতেমকে কল্পলোকে ভাসিয়ে তোলে— শারিবার মুখে শুনি—

"শারিবা বলে পাপ! নানি, যার সমাজ নাই তার
পাপ নাই।
রহু কি হামরাদের ভগবান?
— আঃ হা?
— হিন্দুর ভগবান আছে, মোছলমানের আছে আল্লা,
খিষ্টানের যেশু।
তো হামরার বাজিকরের রহুই সি ভগবান, কি আল্লা,
কি যেশু।
লয়?"[৩]

শারিবা তার নানিকে পরীক্ষা করতে চায়। সে যেন শুনতে চাই বৃদ্ধা এ প্রশ্নের কী উত্তর দেয়। কিন্তু বৃদ্ধা নানি একবার উত্তর খুঁজে পায় না। প্রশ্নটা সে নিজেই নিজেকে করেছে, এর উত্তর পেতে চেয়েছে। চতুষ্পার্শের সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের এক বা একাধিক অস্তিত্বের উপস্থিতি একথা সাধারণ ভাবে বোধগম্যও হয় না। এটা অন্য কারো সমস্যা নয়।

মানুষ ভাষার মাধ্যমে মানসিক প্রক্রিয়া চালায়, এর নমুনা রহুচণ্ডালের যাযাবর বৃত্তির মধ্যে আছে। এমন ঘটনা পাশাপাশি থাকা দুই বা তার বেশি সামাজিক কৌমের মধ্যে থাকে৷ তার পরিণতি ভাষার বহমানতা। ভাষার ঋণ, ভাষার মিশ্রণ, আসলে নিরবচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় এই সমস্ত ইভেন্টগুলো

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্মৃতিসৌধকে মান্য করে চলে। শারিবারা পূর্বপুরুষের সঙ্গে সংলাপ চালায় সাংস্কৃতিক দূরত্ব ও সময়ের দূরত্বের মধ্যে অসম পরিসরে একটি সরলরেখা তৈরি হয়। কিন্তু গল্পে শারিবার সঙ্গে তার পূর্বপুরুষের সংলাপে বাধা থেকেই যায়। শারিবা তার নানিকে বলে—

> *"কেম্‌কা বুলি ক'ছেন তুই নানি, বুঝা পারি না।*
> *ওলা কি হামরাদের আগ্‌লা দ্যাশের বুলি?"*[৪]

পীতেমের আমল থেকেই যাযাবর গোষ্ঠীর প্রধানের একই ধারণা যে তারা খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে, তাই একে তারা ভিক্ষাবৃত্তি বলে ভাবতে রাজি নয়। শারিবা ও একে ভিক্ষাবৃত্তি বলে মানতে রাজি নয়। কারণ শারিবার সংস্কৃতিতে ঢুকে গেছে রাষ্ট্রীয় সংস্কার। শারিবা বলে চিহ্ন ধারণ করার অর্থাৎ অস্তিত্ব জাহির করার সময় এসেছে। কারণ তারা বাস্তবের ছায়ামাত্র নয়, তারাই বাস্তব। আর এখানে শারিবার চাইতে তার নানি লুবিনি অনেক বেশি পরিণত ও বাস্তব। লুবিনি শারিবাকে বলে—

> *"শোন শারিবা, গোরখপুর আমাদের নিজেদের জায়গা নয়। আমি শুনেছি তোর নানার, নানার কাছ থেকে, সে শুনেছে তার নানার কাছ থেকে। আমরা ছিলাম গোরখপুরের আরো পশ্চিমে কোনো এক মরুভূমি আর বালির মুল্লুকে। আর গোরখপুরের বাজিকরের বসত একমাস কি দু'মাস, একে কি বসত বলে? ...*
>
> *তখন রমণীরা পরত ঘাঘরা আর কামিজ, পুরুষরা পড়ত নুগরু আর কূর্তি। এখন দেখ সব মেয়ে শাড়ি পরে, পুরুষরা পরে ধুতি আর লুঙ্গি। সে সব ছেড়ে দিল— তার নিজের ভাষা, নিজের পোষাক, নিজের*

আচার-আচরণ নিজের ক্রিয়া-কর্ম, সব। কেন রে শারিবা, কেন?"[৫]

অথচ গল্পের নানিই প্রথমে একথা বলেছিল যে— বাজিকর যেখানে যায় সেখানকার ভাষা, ধর্ম, সংস্কার, আচার আপন করে নেয়। অন্ধকার ঘরে বিগত দিনের কথা শারিবাকে বলতে গিয়ে সেই অন্ধকারের গহণ রহস্যে ঢুকে পড়ে নানি লুবিনি। **Conscious mind** বা সচেতন মনে সে বাজিকর, দেশের পর দেশ ঘুরে খেলা দেখিয়ে রোজগার করে তারা, আবার **Sub-conscious mind**-এ অর্থাৎ অবচেতন মনের গভীরে অবদমিত ইচ্ছায় তার মনে থিতু হওয়ার কথা বার বার উঁকি দিয়ে যায়। নানি, শারিবাকে বলে—

"জানিস শারিবা, তোর নানা চাইছিল গেরস্থ হবার। চাষি-গেরস্থ। নিজের ভইস থাকবে, হাল-লাঙ্গল থাকবে, ভুঁই থাকবে।"[৬]

অর্থাৎ চাষ গৃহস্থ হয়ে স্থিতি পাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছা বাজিকর যাযাবরদের মনে ছিল। আর এখানেই বাস্তবের বিকল্প গ্রন্থনা।

ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন, জামিরকে সামঞ্জস্যময় মিলনের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। লুবিনি, জামিরের ভেতরে পুবের দেশের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ আত্মস্থ হতে দেখে। শিশুরা এখন আগে স্থানীয় ভাষা শেখে, তারপর মা-বাপের কথা বা বুলি শেখে। আর বাজিকর ও ইচ্ছাকরেই এই দেশের ভাষাতেই কথা বলতে চায় বেশি সময়। তবে এই পরিবর্তন জামিরের ভাল লাগে। কারণ বাজিকরেরা জানে তারা পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে না, আর একথা পীতেমও বুঝেছিল।

হিন্দু-মুসলমান তাদের আল্লা-দেব-দেবী এই সব ধর্মীয় চিহ্নগুলি কোনো কৌম সমাজকে সুসংবদ্ধ আকার দেয়। রহুচণ্ডালের যাযাবর বাজিকরেরা রাষ্ট্রীয়

কানুনে সিদ্ধ হয়ে গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য পেতে চেয়েছে। অভিজিৎ সেন বিষয়বস্তু নিয়ে যতটা ভেবেছেন— কর্মের কথা ততটা ভাবেন নি। আসলে পশ্চিমের আদলে তৈরি হচ্ছে ভারতীয় জীবনে আর তার পরিমার্জিত সিভিল ফর্মকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে— নানান প্রান্তিক-কৌম-গোষ্ঠী-দল।

লেখক অভিজিৎ সেন সমাজের একাধিক বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন 'রহুচণ্ডালের হাড়' নামক উপন্যাসটিতে। স্থায়ী সমাজ ও সামাজিক পরিচয় পাবার আশায় জীবনের চিরন্তন ছুটে চলার প্রয়াসকে ব্যাখ্যা করেছেন বাজিকর সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার অনুশীলনে। কিন্তু তাদের স্থায়ী ঠিকানা পাওয়া সহজ নয়। যদিও তারা জানে 'জমি' পেলেই স্থিতি পাওয়া যাবে, আর স্থিতি মানেই পরিপূর্ণ সুখ। সেই আশাতেই তাদের সুদীর্ঘ কাল ধরে পথ চলা। বৃদ্ধা লুবিনি তার নাতি শারিবাকে বাজিকরের পূর্বপুরুষের কাহিনি শোনায় আর এভাবেই বাজিকরের যাযাবর জীবনের ইতিহাস সঞ্চারিত হয়ে চলে পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে।

ভূমিকম্পে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া বাজিকর সম্প্রদায় ছুটে চলেছিল পূবের দিকে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষ রহু, দনুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় বৃদ্ধ দলপতি পীতেম মাঝি। দলপতি পীতেমের নির্দেশ অমান্য করার সাহস ছিল না বাজিকরের। তার নির্দেশেই বাজিকরের পূবের দিকে বয়ে চলা। মুষ্ঠিমেয় গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব জীবন বাজিকরের। তাই দলপতির নির্দেশই তাদের কাছে শেষ কথা। আবার পীতের দলপতি হয়েও সালমাকে বিয়ে করতে পারেনি কারণ সংস্কার ও ঐতিহ্যবোধ তার চেতনাকে অবদমিত করে রাখে। দলপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও দলকে অতিক্রম করে গণ্ডির বাইরে সহজে কেউ যাওয়ার সাহস করতে পারেনি। কিন্তু সাঁওতালদের উৎসবে বহেরা গ্রামে যাওয়ার পরই বাজিকর জীবনের ছাঁদে লাগল জোয়ার। বাজিকরের যোগ্য উত্তরসূরি— ধন্দু, পরতাপ, বালি, যাদের হাতে বাজিকর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত, তারা সচক্ষে অনুভব করে সুখ কি। পরতাপের

স্ত্রী যখন পরতাপকে অনুযোগ করে যে কিসের টানে সে এতদিন তার স্ত্রীকে ভুলে ছিল। পরতাপ ভেবে পায় না, কি দিয়ে সে বোঝাবে যে কিসের টানে সে ভুলে ছিল— সে জীবনের কথা। যে জীবন বাজিকরের কাছে অকল্পনীয় ও অযাচিত তার কথা।

ভয় ও দ্বন্দ্ব যাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। স্থায়ী সমাজ জীবন যাদের স্বপ্নের বিষয়বস্তু। যারা প্রতিনিয়ত চেনা-অচেনা প্রবহমানতায় বয়ে চলেছে। তাদের কাছে সংসার, স্থিতি, সুখ পাওয়ার হাতছানি তাদেরকে কল্পনায় ভরিয়ে তোলে। সাঁওতাল জীবনের মুক্ত স্বাদ পেয়ে, চাষের আনন্দ পেয়ে বাজিকর যুবকের সঙ্গে দলপতি পীতেমেরও মনের স্থায়িত্বের স্মৃতিমুখ জেগে ওঠে। তার মনে হয় ভিখমাঙ্গার কাজ নয়, আসল কাজ হল চাষের কাজ, কল-কারখানার কাজ। বাজিকরদের যে শারীরিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য রয়েছে তাতে তাদের ভিক্ষা করা মানায় না। আর এই চিন্তাধারা পীতেম দলপতি দলের নবযুবকদের মনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আর তখনই ধন্দু, পরতাপ, বালি, জমির প্রভৃতি বাজিকরদের কাছে মূল আকাঙ্খিত বস্তু হয়ে ওঠে, একটুকরো জমি। কিন্তু ভাগ্য তাদের বিমুখ। বারবার তাদেরকে উৎখাত হতে হয়, জমি বা স্থিতি তারা পায় না তবুও স্বপ্ন তাদের ক্লান্ত হয় না।

বাজিকর যাযাবর জীবনে যুবকেরা স্বপ্ন দেখে জমির। জমিতে চাষ করে ফসল ফলিয়ে সুখ নিতে চায় তারা আর যুবতিরা চায় স্বামী, সন্তান, সংসার। সামর্থ ও শক্তি দিয়ে উপার্জন আর সংসারের মায়াবন্ধন পাওয়ার আশায় তারা মেতে উঠে। কিন্তু পায় না। পেমা, পলবিদের চরিত্রচ্যুতি ঘটে সংসার-সুখ তারা পায় না। বাজিকর মেয়েদের বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠবের জন্য তাদের ছাউনিতে পুরুষদের আনাগোনা অবাধে চলে। গুপ্ত বিদ্যা, ওষুধ বিক্রি করেই তাদের দৈনন্দিন জীবন হয় অতিবাহিত।

দলপতি পীতেম এক চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়। পূর্বপুরুষের রহু, দণুও যার সমাধান করে যেতে পারে নি কারণ বাজিকর জানে না তারা হিন্দু না মুসলমান। রহু ও দণুর আমলে সাম্প্রদায়িকতা বোধ এত তীব্র ও প্রকট ছিল না, কিন্তু দলপতি পীতেমকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ দেশ ভাগের সংকটে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জাতীয় জীবনে প্রবল প্রভাব ফেলে। জাতিগত পরিচয় থাকার প্রয়োজনীয়তা বাজিকর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল। বাজিকর সম্প্রদায় এতদিন ভাবত রহুই তাদের ঈশ্বর, আপদ-বিপদের রক্ষাকর্তা কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, যুগসঙ্কট, কাজ করার ইচ্ছা, এক টুকরো জমি, সংসার, স্থায়ী ঠিকানা প্রভৃতির মৌলিক চাহিদা তাদের বিশ্বাসকে সত্য ও বাস্তবের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। বাজিকর পরিবর্তনের সাথে সত্য ও বাস্তবকে উপলব্ধি করল। আর এখান থেকেই শুরু হল বাজিকরদের নতুন জীবনবোধ সংগে এগিয়ে চলার শক্তি।

অভিজিৎ সেন দেখান, বাজিকর সম্প্রদায় বাঁশবাজি, দড়িবাজি, ভেলকি-ভানমতির খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তোলে। কিন্তু বাজিকরেরা ভৌতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে, বাস্তবকে অস্বীকার করে, তারা কতকগুলো সংস্কারকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্থ ও ভালবাসে। কোনো এক শনিবারের ভূমিকম্পের পর বাজিকরের ছাউনি পড়ল রাজমহলের গঙ্গার ধারে। তাদের সঙ্গে থাকে পশু, আর এই পশুগলি সবই চুরিকরা। বাজিকরের যেহেতু গোটা বিশ্বই তাদের ঘর তাই তারা পথের মধ্যে যা পায় তাই সংগ্রহ করে নেই।

'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বাজিকরদের মানসিকতা, তাদের অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছা, স্থায়ী ঠিকানা পাওয়ার আশা, সমাজবদ্ধ হয়ে বেঁচে থেকে সংসারী হওয়ার ইচ্ছা প্রভৃতি তাদের কাছে কাম্য হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে শেখে স্থায়ী সমাজ, স্বীকৃতি, ঠিকানার মধ্যেই রয়েছে স্থায়ী সুখ। তাই বাজিকর একদিকে যেমন তাদের সংস্কারের পৌরাণিক ঐতিহ্য ভুলে যেতে পারে না, তেমনি বাস্তব

সুখটাকেও এড়িয়ে যেতে পারে না। এখানে বাস্তবের বিকল্প রূপ ও তার বিকল্প গ্রন্থনা ফুটে ওঠে। উপন্যাসে মোট তিনবার স্থায়ী ঠিকানা লাভের চেষ্টা করে বাজিকরেরা। প্রথমবার দলপতি পীতেম মাঝির নেতৃত্বে, দ্বিতীয়বার পরতাপ আর তৃতীয়বার জামিরের হাত ধরে যাযাবর বাজিকর সম্প্রদায় স্থায়ী সমাজ ও ঠিকানা পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে এসে দেখি ঔপন্যাসিক শারিবার হাতে সে। শারিক ও মালতী ঘর ও সংসারের আশায় গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মনে হয় যেন তারা দুজনে তাদের পূর্বপুরুষের বহুদিনের ক্লান্ত জীবনের সুপ্ত ইচ্ছাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য সচেতন ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। উপন্যাসের শেষে স্থিতি প্রশ্নটি সচেতনভাবে জোরালো হয়ে ওঠে।

পিতেম ও সালমার গোপন ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তারা সম্পর্কের বাঁধন বাঁধতে পারল না। কারণ, পীতেমের পিতা দনু বানজারা যুবতীকে ভালবাসত। তাকে বিবাহ করতে পারেনি, কিন্তু ভালবাসার অধিকারে সেই বানজারা যুবতী এক সন্তান পেয়েছিল, সেই সন্তানই সালমা। অর্থাৎ পিতেম ও সালমার দেহে একই পিতার রক্ত বইছে, আর এইজন্যই তাদের মিলন সম্ভব নয়। অথচ উভয়ে উভয়েই প্রচণ্ড ভালবাসে। ভালবাসার প্রচণ্ড আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারেনি। এখানেই অভিজিৎ সেন বিকল্প বাস্তবের, বিকল্প গ্রন্থনা দেখিয়েছেন।

আর একটি প্রণয় কাহিনি পুরা ও পালির ভালবাসা। প্রাণের টানে যারা বেরিয়ে পড়েছিল অবশেষে পেয়েছিল এক মর্মান্তিক জীবন। সালমা পীতেমকে ভুলতে পারেনি। পীতেমের পাশে থেকে, পীতেমের ভয়াবহ দিনগুলোকে নারীজীবনের অমূল্যসম্পদ দিয়ে রক্ষা করেছিল। কিন্তু পীতেমের স্থায়ী ঠিকানা ও সমাজ পাওয়ার আশা সালমাকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ পীতেম জানে পথে পথে ঘুরে বেরিয়ে যাযাবর বৃত্তির মধ্যে জীবনের সুখ নেই। জীবনের সুখ আছে চাষ-বাসে, কলকারখানায় গতর খাটায়, ধর্মীয় ও সামাজিক চাহিদা পূরণের

মধ্যে। আর এই ইচ্ছে বাজিকরের বহুদিনের তাদের পূর্বপুরুষের। আজ যখন জমিদার বাদিউল ইসলাম তাদের জমি দিয়ে, সামাজিক মর্যাদা দিতে চেয়েছে তখন বহুদিনের সেই আকাঙক্ষা পূরণের জন্য, তাঁর ভালবাসার পাত্রীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, আর এ নিয়ে পীতেমের প্রতি সালমার অভিমান ও আমরা ফুটে উঠতে দেখি। প্রিয়জনকে না পাওয়ার একটা চাপা বেদনা তাকে প্রতি মুহূর্তে পীতেমের প্রতি অভিমানী করে তুলেছে। সালমা ভেবেছিল পীতেম যদি একবার বলত এ জমি আমি চাই না, স্থিতি চাই না, তুই আমারই কাছে থাক৷ পারেনি পীতেম সালমাকে ফিরিয়ে আনতে৷ জমির টানে, স্থিতির টানে পীতেম সালমাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্তই নেই। কিন্তু সালমাকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। মৃত্যুর সময় ঘোলাটে চোখের চাহনিতে পীতেম খুঁজে ফেরে একটি মুখ। পরতাপ, বালি, জমির একথা অনুভব করে এবং তারা পীতেমকে বলে সে সালমাকে দেখতে চাই কি না। পীতেমের মৃত্যু সংবাদ সালমার দৈনন্দিন জীবনের ছকে কোনো বিপ্লব ঘটায় না, কারণ বাদিউল জমিদারের রাখনি হয়ে অনেক সম্পত্তির মালিক সে। আর সে কারণেই বাজিকরদের স্পষ্টতই অবজ্ঞা করে সালমা।

মানুষ সব পরিস্থিতিতেই বাঁচতে চায়। জীবনের নানান সুখ-দুঃখ, চড়াই-উৎরাই এর মধ্যে সবসময়ই বিকল্প খোঁজে। পীতেম তার ভালবাসার পাত্রীকে ত্যাগ করে জমির টানে বিকল্প হিসেবে স্থিতি খোঁজে। সালমা ও পীতেমের কাছে প্রত্যাখ্যান পেয়ে অভিমানি হয়ে বাদিউলের সঙ্গি হয়ে বাঁচার বিকল্প খোঁজে। জমিদার বাদিউলের অর্থে সালমা নিজের বাজিকর সমাজকে অবহেলা করে। প্রত্যক্ষভাবে সালমাকে আত্মপরায়ণ, দাম্ভিক মনে হলেও পরোক্ষভাবে সে ছিল উপেক্ষিত, বঞ্চিত নারীমুখ। তার জীবনের সুখের বিনিময়ে বাজিকর স্থিতি পায় কিন্তু সালমা স্থিতি পায় না। বাদিউল ইসলামের মৃত্যুর পর তার জীবন নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে৷ জীবিত অবস্থার বাদিউলের পরিবার সালমাকে স্বীকার করতে

পারেনি। তার মৃত্যুর পর সালমাকে তারা সম্পত্তির অধিকার থেকে বিতাড়িত করে। সালমা তার বাজিকর সম্প্রদায়ের হাতে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রাতের অন্ধকারে খুন হয়। সালমার অর্থ আত্মসাৎ করার জন্যই তারা তাকে হত্যা করে। সালমাও জানত তার এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থা সে নিজেই সৃষ্টি করেছিল। পীতেমের জমির প্রতি, স্থিতির প্রতি টানকে সালমা ব্যঙ্গ করত। বাজিকর ছাউনিতে যতবার আপদ হয়েছে সালমা ততবারই পীতেমকে মানসিক ভাবে শাস্তি দিয়েছে। এর পিছনে ছিল পিতেমের প্রতি সালমার দুর্বোধ্য ভালবাসা। ধন্দুর মৃত্যু, পেমার মৃত্যু, একে একে সন্তানদের চলে যাওয়া, স্ত্রীর যক্ষারোগে মৃত্যু, পীতেমের জীবনের এই দুঃখময় মুহূর্তগুলোর নীরব সাক্ষী সালমা। সালমাই তাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে মানসিক শক্তি যুগিয়েছে।

দারোগা জানকীরামের পুত্রের খুন হওয়ার পর, পুলিশ পেমা, পীতেম, সালমাকে নিয়ে যায় থানায়। থানায় অসুস্থ পীতেমের উপর অত্যাচার শুরু হলে সালমা প্রতিরোধ করে। পীতেমের প্রতি ভালবাসার টানে, পীতেমকে রক্ষা করার জন্য কামাসক্ত দারোগার সামনে নিজের শরীরকে তুলে দিতেও দ্বিধা করে না। আর বাস্তব সত্য এভাবেই বিকল্প রূপ ধরে। ধন্দুর মৃত্যুর পর পীতেম মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে ওঠে। আবার সালমা যখন পীতেমের সামনে ধন্দুর শিশুপুত্রকে তুলে ধরে তখন সে দনু বলে আর্তনাদ করে ওঠে, জীবন ফিরে পায়। পুনরায় দৈনন্দিন জীবনের ছন্দে ফিরে আসে। পীতেম জমির বিনিময়ে সালমাকে হারিয়ে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। একদিকে স্থিতি পাওয়ার অস্তিত্বের সংকট, আর অন্যদিকে ভালবাসার পাত্রীকে হারিয়ে অন্তরাত্মার উদ্বেগ— এই দুয়ের টানাপোড়েনে পীতেম অস্থির হয়ে ওঠে।

বাজিকরের কাহিনি যেন স্থিতি পাওয়ার কাহিনি। এই স্থিতি পাওয়ার লক্ষ্য বারবার প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে উৎখাত হতে হয়েছে। আশা ভঙ্গ হয়েছে বারবার। কিন্তু বাঁচার তাগিদে বিকল্প পথ খুঁজে নেই। নমনকুড়ির জমি দেখে

পীতেম ভাবে কীভাবে বাদিউল তাদের ঠকিয়েছে। সরকারি জমি বিলির সময় সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে পীতেম জমি ক্রয় করে কিন্তু জমিদার ও নায়েবের চলনার শিকার হয়ে অর্থ ও জমি সবই হারিয়েছে। পুলিশের কাছে নালিশ জানিয়েও লাভ হয় না। স্থিতি লাভের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হলেও জমিরের ফলান তরমুজের সুঘ্রাণ নিতে নিতে পীতেমের চোখ অজানা সুখে চকচকে হয়ে ওঠে। যে মানুষটি জীবন যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তে বারবার প্রতিহত, পরাজিত, বঞ্চিত হয়েছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও সে মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়ানোর অভীপ্সা খোঁজে। একেই বলে জীবন চক্র। শত বাধা, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুখের আশায় হন্যে হয়ে খুঁজে মরে। আর এর মধ্য দিয়েই অভিজিৎ মানব জীবনের বিকল্প গ্রন্থনাকে তুলে ধরেছেন। পীতমে বুকে আশা ছিল। যে আশার আলোয় ভর করে মানুষ বেঁচে থাকে। বাজিকর জীবনের গোত্রহীনতা, বিচ্ছিন্নতা, স্থানচ্যুতি জেনেও পীতেম আশায় বুক বাঁধত সেদিনের, সুদিনের। তাই তার পূর্বপুরুষ রহু, দনুর নির্দেশে সে এগিয়ে চলেছিল পূব থেকে পূবে, আরো পূবে। কারণ পূবেই রয়েছে তাদের স্থিতি আর সুখ। পীতেমের বিশ্বাসের ফল ফলতে বিলম্ব হয়েছিল, কিন্তু পূবের 'তরক' তারা পেয়েছিল।

রোড রোলার চালক হানিফ পুকুরের পাশে দেখেছিল জলপরী পলবিকে। পলবি স্থিতির টানে লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা হয়। বহুপুরুষের হাত ফেরত হয়ে ওঠা পলবির ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কা ছিল সবারই। সেই স্বৈরিণী পলবি যখন হানিফের সঙ্গে সংসার পাতল তখন বাজিকর ছাউনিতে খুশির প্লাবন লাগল। পলবি পেল স্থিতি, স্থায়ীত্ব, সংসার জীবন, যা বাজিকরের পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা এক মৌলিক অবদমিত ইচ্ছা।

দেশ ভাগের প্রবল তাড়নায় অসংখ্য বাজিকর মুসলিম ধর্মগ্রহণ করল, ফলে তারা পেল একটি জাতীয় পরিচয়। আবার কেউ কেউ পিতৃপুরুষের সেই যাযাবর বৃত্তিকেই মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরে পরিচয়হীন থেকে গেলো। রূপা

বাজিকর ও তার স্ত্রী বিষহরির গান গেয়ে ঘুরতে লাগল। মুসলিম ধর্মে বিধর্মীকে মুসলিম ধর্মান্তরিত করার মধ্যে ধর্মপালনের দায়িত্ব অর্জন করা যায়। আর তাই মুসলিম ধর্ম যারা গ্রহণ করল তাদের পক্ষে ধর্মান্তরিত হওয়া সহজ হল। বাজিকর সম্প্রদায় তাদের যাযাবর, ভাসমান জীবনের পরিবর্তে পেল স্থায়ী জীবন। যে শারিবার হাতে লুবিনি সঁপে গিয়েছিল বাজিকর জীবনের ইতিহাস, সেই শারিবার হাত ধরে বাজিকর পেল অন্য মূল্যবোধের ব্যঞ্জনা। অনাত্মীয়, অসহায় মালতী, ওমরের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে একাকী বেঁচে থাকার লড়াই করছিল সেই মালতীর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বাজিকরদের ভবিষ্যত প্রতিনিধি শারিবা। নিরূপায় মালতী প্রশ্ন করেছিল 'হামার ছোঁয়া'? বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শারিবা উত্তর দিয়েছিল, 'হামার ছোঁয়া হবে' এর পরেই হাত ধরে ফিরে এসেছিল গ্রামের দিকে।

বাজিকর যুবতী পেমাও ভেসেছিল সংসার লাভের আশায়। দারোগার পুত্র আনন্দের বলিষ্ঠ সুপুরুষ চেহারার আকর্ষণে তরুণী পেমা বাজিকর জীবন ত্যাগ করে। আনন্দ পেমাকে অনেক সুখ স্বপ্ন দেখিয়েছিল, পেমাও ভুলে গিয়েছিল তার সামাজিক অবস্থিতি। সালমার সাধারণ বাণীকেও সে অস্বীকার করে। আনন্দ পেমাকে সম্ভোগ করে আনন্দসুখ পেতে চেয়েছে। পেমার সন্তান সম্ভবার কথা শুনে আনন্দর নেশা কেটেছে। বাড়ীর পরিচারিকার দ্বারা পেমাকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। আর এ অপমান পেমা সহ্য করতে পারেনি। রাগে, অপমানে, ঘৃণায় পেমা হাতের ছুরি ছুঁড়ে আনন্দকে আঘাত করতে চেয়েছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে ছুরি ঘোড়ার শরীরে বিদ্ধ হয়েছে এবং সেই ঘোড়ার চাটের আঘাতে আনন্দ খুন হয়। পেমা অপমান, গ্লানি নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাজিকরের ছাউনিতে প্রবেশ করে। হঠাৎ পেমার ফেরাকে কেন্দ্র করে কারো মনে কোনো কৌতুহল নেই। পেমা স্থিতির টানে বাজিকর জীবনকে উপেক্ষা করে স্ত্রী হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু পাইনি। আনন্দর মৃত্যুর পর পুলিশ আসে।

পেমায় থানায় নিয়ে গিয়ে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়, ফলে সন্তান সহ পেমা মারা যায়। পীতেম জানত পেমার এই পরিণতির কথা। পেমার এই করুণ পরিণতি সকলকে নাড়িয়ে তুললেও বাজিকরদের মনে স্থায়ীত্ব সন্ধানের যে আশা তাতে কোনো ছেদ ঘটেনি। মোহগ্রস্থের মতো তারা চালিত হয়েছে বারবার তারা মৌলিক প্রশ্নের টানাপোড়েনে চালিত হয়েছে। বাজিকর যুবকের তখন অন্য সম্প্রদায়ে মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছে তখন তাদের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক পরিচয়গত সমস্যা। আবার যখন বাজিকর যুবতি মেয়েরা অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছে তখন সেখানে তাদের সামাজিক অবস্থিতি সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থিতি পাওয়ার আশা তাদের বার বার ব্যর্থ হয়েছে। জমিদার, দারোগা থেকে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই বাজিকরদের ছাউনিতে প্রবেশ করেছে, শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য, আর তার পরই তারা তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেই রাস্তায়।

বাজিকর যুবক সোজনের সঙ্গে নমশূদ্র পাড়ার পাখি ভালবেসে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল। বিয়েও করেছিল তারা। কিন্তু এই বিয়ে মেনে নিল না নমশূদ্র পাড়া। পাড়ার মাতব্বররা এলো বাজিকর দম্পত্তির কাছে এবং পাখিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য আর্জিও জানাল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ভয়ে পাখি ফিরে গেল নিজ নমশূদ্র পাড়ায়। কিন্তু সোজন ও পাখির কয়েকদিনের সুখ-স্মৃতি তাদেরকে জীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে দিল না। সোজন মনের দুঃখে বসে থাকে নদীর ধারে, পাখিও ফিরে আসতে চায়। কিন্তু সামাজিক বাধাকে লঙঘন করতে পারে না। এদিকে সোজন যখন তিলে তিলে শেষ হয়ে হারিয়ে গেল তখন পাখির সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ল সমাজপতিদের উপর। পাখি সামাজিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে মেতে ওটে সর্বনাশী খেলায়। নমশূদ্র পাড়ার পুরুষেরা পাখির ঘরে আনাগোনা শুরু করে। অবৈধ সম্পর্কের জেরে সে একসময় মৃত্যুকে মেনে নেয়। জীবনের অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা সোজন ও পাখি উভয়েরই

বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে শেষ করে দেয়। দুটি জীবনের অকাল মৃত্যু দুটি প্রাণের অপচয়কে অভিজিৎ সেন খুবই দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আলোচিত প্রত্যেকটি সম্পর্কের মধ্যে, ঘটনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, চেতন-অবচেতন মনে বারবার যে একই সুর ধ্বনিত হয়েছে তা হলো, স্থিতির সন্ধান। এ ভূমি শুধু জমি নয়, মনের ভূমিও বটে। বাজিকর মনের ভূমির মধ্যে স্থায়ীত্ব পেতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে সুভদ্র যেমন উত্তর দিকের জানালা খুলে তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল ঘুঁচিয়েছিল। তেমননি বাজিকরেরা আজ তার পাঁচ পুরুষ ধরে অর্থাৎ প্রায় ১৫০ (দেড়শো) বছরের পর বহু আকাঙ্খিত স্থিতি লাভের চেষ্টায় সফল হয়। যদিও তারা বিভিন্ন দলে, সমাজে, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে স্থিতি পায়। পাঁচ পুরুষের সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যাও দেখতে পাই।

'রহুচণ্ডালের হাড়' বাজিকরদের মুখর সংগ্রামের ইতিহাস। কাহিনির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে জানতে পারি, পুরাকালে এদেশে প্রাচুর্য ছিল, অগাধ অপার জীবন ছিল, অনিঃশেষ আনন্দ ছিল। এক সময় রহুর দেশে রাহু হয়ে বিদেশী এক শক্তির আবির্ভাব ঘটল। তারা আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন ও স্বভাবে ছিল হিংস্র ও নৃশংস। এই বিদেশী আগ্রাসী শক্তি একসময় আগ্রাসী হয়ে উন্নত অস্ত্র ও শস্ত্র নিয়ে, এক বিশাল শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সবকিছু দখল করে বসে। রহুর পবিত্র নদী ও তার জলধারা তারা অধিকার করে রহুর সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে। নদীর পাড়ে ওরা মন্দির স্থাপন করে। অবশেষে নদীর অধিকার নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ হয়। খড়গাঘাতে রহুর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেই নদীতেই ছিটকে পড়ে। রহুর ক্ষত থেকে জলস্তম্ভের মতো রক্ত উথলিতে লাগল। এবং সেই রক্তে প্রবল বন্যায় নদী উঠল ফেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী ধ্বংস করে দেয়। রহুর দলত্যাগীদের ভূ-খণ্ডকে গ্রাস করল। কেবল রহুর অনুগামীরা রহুর দেহকে আশ্রয় করে ভেসে যেতে থাকে দূর-দূরান্তে। অবশেষে বন্যার বেগ মন্দীভূত হলে

তার তারে আশ্রয় নিয়ে রহুর দেহের অস্থি কয়খানি আশ্রয় করে নতুন পথে অগ্রসর হয়।

রহুর অস্থি ক'খানিই বাজিকরের অলৌকিক শক্তির উৎস ও বেঁচে থাকার আশ্বাস। বাজিকরের রক্তে রয়েছে ছুটে চলার নেশা। ওরা ছোটে পথ হতে পথে, নদী-নালা, দেশ, ভূমি, নির্জন মাঠ পর্বত ইত্যাদি পিছনে ফেলে তারা ছোটে। গৃহস্ত জীবনের নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট প্রশান্তিময় অথচ স্থবির জীবনের প্রতি বাজিকরের তীব্র আকর্ষণও আছে। বাজিকরদের এই ছুটে চলার পেছনে যে যে তীব্র আকাঙক্ষা বা সন্ধান কাজ করে সে বিশ্বাসটি হল রহুচণ্ডালের হাড়। পীতেম ও জামিরের মতো শারিবা জানে রহুর হাড় লুকিয়ে আছে পূবের দিকে কোনো এক ভূ-খণ্ডে, যে স্থানটি বাজিকরকে খুঁজে বের করতে হবে। সেই স্থানটি খুঁজে বের করার জন্যই বাজিরদের ভূ-পরিক্রমণ। তাদের সমস্ত স্থিতি, স্থায়িত্ব, স্বস্তি ও শান্তি হবে সেই ভূ-খণ্ডে। তাই সমস্ত বাজিকর সেই হাড় খোঁজে।

বাজিকর সম্প্রদায় কচুরিপানার দলের মতো ভেসে চলে। মাটির সঙ্গে এদের সংযোগ নেই, আস্থাও নেই। জীবিকার জন্য সম্ভ্রম সম্মত পেশা নেই, এদের নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমতও নেই। এরা জানোয়ারদের নিয়ে বাজি খেলা, দড়িবাজি, বাঁশবাজি করে এবং বস্তুত ভিক্ষাবৃত্তি করেই তারা উদর পূর্তি করে। লুবিনীর কথায়—

> *"বাজিকরের আপন কোনো ধরম নেই। করম এ্যাটা আছে বটে, তো সিটা হল ভিখ-মাঙ্গার কাম। মুলুক, মুলুক ঘুর্যে বান্দর লাচানো, ভানমতির খেলা, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, নররাক্ষস হয়ে কাঁচা হাঁস, কাঁচা মুরগা, কড়মড় কড়মড় কর্যে খাওয়া এল সব*

বাজিকরের কাম।"[৭]

এই অবজ্ঞাত, অবহেলিত, ঘৃণ্য পেশার নেপথ্যে রয়েছে সামাজিক ও শাস্ত্রীয় দীর্ঘকালীন শোষণের ইতিহাস। জনসমর্থিত বিশ্বাস ও নিবেদন উদ্ভূত ভিত্তি বাজিকরের নেই বলে ওরা ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারার সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পারেনি।

বাজিকর সম্প্রদায় নিজেদের ত্রাণকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের সমকক্ষ, শক্তিশালী কোনো সত্তাকে তারা কল্পনা করতে পারে না বাজিকরের এই সামান্য অবলম্বনটুকুও নেই। কেন নেই, এর কারণ কী? এর ব্যাখ্যা লুবিনী ও অন্য কারো কাছেও নেই। তাই শারিবার প্রশ্ন শেষপর্যন্ত প্রশ্নই থেকে যায়। বাজিকর সমাজ কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় ঈশ্বরকে খুঁজে পায় না। রহুই ওদের সুখ-দুঃখের সর্বোচ্চ অতি পারক্রমিক শক্তি। কিন্তু রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। মূলত সে প্রাচীন এক দলপতি। তাই রহুর উপর দেবত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ দেবত্ব আরোপের জন্য নিঃসংশয় ধর্মীয় ভিত্তি ও সামাজিক স্থিতি বাজিকরের কোনো দিনই ছিল না। ওলা মাই, কালিমাই, বিগা মাই এরা বাজিকরের অজ্ঞাত সব লৌকিক দেবতা।

শনিবারের ভূমিকম্পে সব ধ্বংস হয়ে গেলে দলনেতা পীতেম গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। অচৈতন্য ঘুমে পিতা দনু এসে বলে,—

"পীতেম হে, পীতেম, পূবের দেশে যাও বাপ। সিথায়
তুমার নসীব।"[৮]

পূর্বপুরুষের এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে পীতেম মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছুটে চলতে শুরু করে। তারপর শুরু হয় নিরবচ্ছিন্ন পথ পরিক্রমা। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ-খরা-শীতকে উপেক্ষা করে পীতেম দলপতি তার দলবল নিয়ে পূবের দিকে এগিয়ে চলে অজানা উদ্দেশ্যের সন্ধানে। অনির্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমান হয়ে পথের পর পথ

এগিয়ে চলে। আর এই অজানা, উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় ক্ষুধা-অনিদ্রা-অনাহার-রোগ-শোক-মিলন-বিচ্ছেদ-নানা মানসিক যন্ত্রণা ওদের অন্তরাত্মাকে কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দেয়। শরীর, মন, অন্তারাত্মা তাদের ক্লান্ত হয়ে ওঠে এবং অবশেষে তারা মাটিকে আঁকড়ে ধরে স্থায়ী ঠিকানা পেতে চেয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ পেতে চেয়েছে। থিতু হবার সুপ্ত ইচ্ছা প্রথম জাগ্রত করায় লক্ষণ সোরেন, দলনেতা পীতেমের ভিতরে। সাঁওতাল জীবনযাত্রার সাথে কয়েকমাস গভীর সম্পর্ক থাকার ফলে বাজিকর জিল্লু ও পরতাপের অভিজ্ঞতা নতুন এক জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ওরা মাঠে ধান বোনে ধান কাটে। মাটিতে লাঙল দিয়ে ক্ষেত চাষ করে। অঙ্কুরিত বীজে গোটা প্রান্তর গাঢ় সবুজ হয়ে গেলে মনের গভীরে ওদের আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। এছাড়া সাঁওতালদের অপরিমেয় উত্তেজনা ও উচ্ছাস জিল্লু ও পরতাপকে আকৃষ্ট করে। সংসারের বৃহত্তর পরিসরে থিতু জীবনের যে প্রবল আকর্ষণ মাটির রসে রসে, শিরা-উপশিরায় প্রবহমান, তার খানিকটা এই দুজন বাজিকরের রক্তধারায় নবজীবনে আশার উত্তেজনা আনে।

বাজিকর চায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে। মনের অদম্য ইচ্ছাকে তারা রূপ দিতে চায়। আবার বাজিকরের রক্তের চলিষ্ণু, উষ্ণ রক্তধারার সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্ব। একদিকে স্থিতি পাওয়ার ইচ্ছা, আরেকদিকে বাজিকরের চলমানতার রীতি উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। গার্হস্থ্য জীবনের প্রাকৃতিক ন্যুনতম যে সামাজিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বাজিকর সম্প্রদায়ের মধ্যে তা অনুপস্থিত। চন্দ্র-সূর্য, কৃষি-নক্ষত্র, কৃষি-ব্যবসা, সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা জরুরী। পীতেম বুঝতে পেরেছিল এ এমনই এক বিদ্যা যা বংশ পরম্পরায় অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করতে হয়। পরতাপ, রাজশাহীর চলনবিল এলাকায় প্রথম বুনোধান দেখে মুগ্ধ হয়। তার মধ্যে একজন শুদ্ধ কৃষকের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। মাঠভরা ফলানো ফসলের যে অনির্বচনীয় আনন্দসুখ তা বাজিকরদের মধ্যে প্রথম অনুভব করেছে পরতাপ। ফসল ফলানোর আনন্দ আস্বাদ করতে পেরেছে সে। পরতাপ

সাঁওতালদের সাথে সমান তালে ফসল ফলিয়ে সৃষ্টির আনন্দ পেতে চেয়েছিল। মাঠে ফলানো ফসল বৃদ্ধ পীতেমের মধ্যে নতুন অনুভূতি এনে দেয়। বৃদ্ধ পীতেম অনভ্যস্থ স্থূল হাতে অফুরন্ত ফসল স্পর্শ করে, গন্ধ শোঁকে, ফসলের ডগা দাঁতে কেটে জিভে তার স্বাদ গ্রহণ করে। জীবনের শেষে পৌঁছে পীতেম দলপতির মধ্যে বিশ্বাস জন্মে, বাজিকর সম্প্রদায় তাদের সুদীর্ঘ জটিল অভিশপ্ত অফুরন্ত পথে বয়ে চলা থেকে মুক্তির ইঙ্গিত পেল।

উপন্যাসের শেষে দেখি বাজিকর তাদের আজন্ম বেদুইন বৃত্তি ছেড়ে সমাজ জীবনে স্থিত হয়েছে। আর এর মধ্যে পীতেম অনেকটা আত্মতৃপ্তি পেয়েছে। মাটির প্রতি টান ও স্থায়ী গৃহস্থ হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা জামিরের মনেও সুপ্ত ছিল। নমনকুড়ির উর্বরা জমির ফসল দেখে সে মুগ্ধ হয়। বালি ও জিলুর পুত্রেরা বাজিকর বৃত্তিতে অভ্যস্ত হলে সে উত্তেজিত হয়। সে চায় না যে বাজিকরের পরবর্তী প্রজন্ম বাজিকর বৃত্তিকে অবলম্বন করে অভিশপ্ত পথে চলুক। সে চাই জমি, ফসল, সমাজ, সংসার ঘর। জামির যুগের পরিবর্তন বা সময়ের পরিবর্তনের ধারাকে বুঝতে সক্ষম হয়। তাই জামির চায় পরিচিতি। যে পরিচিতি সামাজিক, ধার্মিক ও রাষ্ট্রিক বোধে তাদেরকে উন্নীত করবে। জামির বোঝে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এই পরিবর্তন ও পরিচিতি ইতিবাচক। কারণ বাজিকর একেক গোষ্ঠী হিসেবে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য কোনোদিনই যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। পীতেমও এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই সংমিশ্রণই বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাজিকর কোনো কাজ ভাল করে করতে পারে না। বারংবার ভুল হতে থাকে, কিন্তু জামির 'ভিখমাঙ্গা'কে ঘৃণা করে বলেই কঠিন প্রায়শ্চিত্য ও শাস্তি সত্ত্বেও মাটির বুক চিরে ফসল ফলাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। অন্তরে মাটির সঙ্গে রক্তের নিঃশ্বাসের, আত্মার একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গাঢ় করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়। কিন্তু মন্দভাগ্য তাদের। ওরা পাট নষ্ট করে, গোরু ঘায়েল করে, চুরি হলে দায় বর্তায় তাদের

ওপর, মহামারী বা মড়কের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাদেরকেই। ফলে জমিদারের অত্যাচারে ওদের ঘর-বাড়ি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বাজিকরের প্রধান সমস্যা তারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। হিন্দু বা মুসলমান কোনো ধর্মের সঙ্গেই তাদের মিল নেই। কিন্তু জামিরের প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা উভয় সম্প্রদায়ের সাথে মিশে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ হতে হয়। তাই সোজন-ঝালোদের মেয়ে পাখিকে বিয়ে করলে জামির খুশি হয়। জাতিভেদ নীতির ফলে, ঝুট ঝামেলা এড়াবার জন্য স্থায়ি মিত্রতা পাওয়ার আশায় পাখিকে ঝালোদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে জামির। দুটি তরুণ প্রেম পূর্ণ হৃদয় চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানুষের অধিকার পেয়ে, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত দৈন্যতাকে তুচ্ছ করেছে তারা। সভ্যতার ইতিহাস পরিক্রমার গতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভাঁজে ভাঁজে অন্যায়, অত্যাচার, নৃশংস-হত্যা, অসহায়তা, লুণ্ঠন, যৌন লাঞ্ছনা প্রতিনিয়ত জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। বাজিকরের অসহায় ক্ষয়িষ্ণু জীবনধারায়ও এর অন্যথা হয়নি। প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিগত কারণেই রাধা ও জামিরের মধ্যে প্রথমে হার্দিক ও পরে দৈহিক সম্পর্ক হয়। বিষয়টি নিয়ে দেদোনের সঙ্গে জমিদারের তুমুল সংঘর্ষ হয়। পরে দেদোন সংঘটিত দলবল নিয়ে বাজিকরের ঘরে আগুন লাগায়, লুঠপাট চালায়, মেয়েদের ধর্ষণ করে, পরতাপের দুটি সন্তানকে অগ্নিদগ্ধ করে, তরতরে শাণিত অস্ত্র দিয়ে দুজন বাজিকরকে খুন করে হিংস্র উন্মত্ততার পরিচয় দেয়। পরে হাড়মার হাতে দেদোনও খুন হয়।

সোজনের, নলুয়া বাদিয়াদের সাথে ভবঘুরে নিরুদ্দেশ হবার পেছনে সূক্ষ্ম এক মানসিক বিষয় জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে পাখিকে হারিয়ে সোজন বনের মুক্ত পাখি ধরার কাজে জড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বাস্তব জীবনের ব্যর্থতাকে সে পাখি ধরার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভুলে যেতে চেষ্টা করে। মনস্তত্ত্বের বিকল্প বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। পাখিও নৃশংস ভাবে খুন হয়। রূপার হাতে

দিগিন মণ্ডলের একজন লোক খুন হয়, ফলে দুই কুঠি বাড়ির উন্মত্ত হাতি ওদের ঘর ভাঙে। ফসল ভর্তি জমিগুলিতে দাপিয়ে কাদা করে। ইয়াছিনের মেয়ে পলবি ধর্ষিতা হয়। নদীর পাড় ধরে দীর্ঘ চল্লিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসে মোহর হাট খোলায় ওদের থিতু হতে হয় এবং জীবিকার জন্য হাটুরে মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য দেহ ব্যবসা শুরু করে। গোটা বাজিকর সম্প্রদায়ের যখন অস্তিত্বের সংকট, স্থিতি, স্থায়িত্বের সংকট ও অনিশ্চিত তখন মাঝে মাঝে কিছু দগদগে ঘায়ের মতো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বাঘাত ওদের মেরুদণ্ডে আঘাত করে। যেমন লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা পলবি বাজিকর সমাজে ফিরে এসে সোমত্ত পুরুষদের যাদুকরী দৈহিক আকর্ষণে বাজিকর পাড়ায় ঘরে-ঘরে অশান্তির আগুন লাগায়। তেমনি এক তীব্র সন্ত্রাসী ওমরের মৃত্যুদৃশ্য। জ্যোৎস্না-শাসিত রাত্রে নদীর জল আর বালুকারাশির মিশে যাবার মধ্যে ওমরের হত্যাদৃশ্য মর্মান্তিক। দূর থেকে প্রত্যক্ষকারী শারিবার অন্তরে স্নায়ুবিক ছিন্নতায়, ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিভ্রমতার জন্ম দেয়। এই ওমর-মালতী সম্পর্কের বিষয় সমাধানের জন্য ভায়রোর কাছে বিচারে বসলে বাজিকর সম্প্রদায় এক মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখিন হয়। যার সঠিক উত্তর ওদের কারো কাছে নেই। প্রশ্ন হল— তুমি হিন্দু না মুসলমান। উত্তরহীন এই প্রশ্নের জবাবে ইয়াছিনের কাতর প্রার্থনা—

> *"হামরাদের আপনার জাতে তুল্যে নেন মালিক। শুন্যাছি আপুনি দিগরের মালিক, সমাজ আপনার কথা শুনবে।"*[৯]

উত্তরে ভায়রো বলে—

> *"হিন্দু ধর্মে এমুন হক কেরো নাই। তুমু ব্রাহ্মণ, কায়েৎ, মাহিষ্য, সদগোপ, নমোশুদদুর কেছুই হবা পারবা না। তুমু ইসব জাতের হয়া জন্মাবা পার, হবা পার না।"*[১০]

এই মৌলিক অস্তিত্বের সংকটে বাজিকরেরা দিশাহারা। পাঁচপুরুষ ধরে দীর্ঘ দেড়শত বছর ধরে এই মৌলিক সংকটের সমাধানের চেষ্টা করেছে তারা। বাজিকর একটি পেশাভিত্তিক সম্প্রদায় তাই এদের ধর্মীয় কোনো পরিচয় নেই। তাই তারা সমস্ত কিছু ছেঁড়ে ছুঁড়ে কুলীন সমাজের স্রোতধারায় মিশে হতে চায়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তারা মাটিকে কাছে পেতে চেয়েছে এবং অনেকটা পেয়েছেও। তাই তারা আর বাজিকর জীবনে ফিরে যেতে পারে না। হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় কোনো সম্ভাবনা না দেখে শেষে হাজী সাহেবের কাছে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। তাদের বিশ্বাস ছিলো আশরাফ মুসলমান না হতে পারলেও সমাজে মাথা উঁচু করে আপন অস্তিত্বকে ঘোষণা করার সামাজিক শক্তি সে অর্জন করতে পারবে। হিন্দুধর্মে হাজারো সংস্কার, দল-উপদল; সে তুলনায় মুসলমান সমাজে দুরুহ জটিলতা অল্প তাই ওদের ধারণা ছিল পথের অভিশাপ থেকে এবার মুক্তি মিলবে। আর কেউ অন্তত বেজাত বলতে সাহস করবে না। স্থান মিলবে, কাজ পাবে, সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে স্থিতি পাওয়ার জন্য বংশ পরম্পরায় বহু রক্তের মাশুল দিয়েছে। এবার সমাধান হয়তো মিলবে পাশাপাশি রহুর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হবে। এই আশায় তারা করেছে। শত শত বছর ধরে যারা শুধু ধুমকেতুর মতো যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। পীড়ন-অত্যাচার যাদের নিত্য সঙ্গী খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি যাদের জীবনে ধ্রুবসত্যের মতো— এই রকম ছিন্ন-ভিন্ন ছিন্নমূল, ধিকৃত, মনবেতর জীবন যাপনকারী সম্প্রদায়কে বৃহৎ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় যদি আপন জাত তুলে নেয় তবে তো সকল সমস্যার সমাধান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মুসলমানেরা সাম্যভাতৃত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করলেও বাজিকরদের বেলায় তা ঘটে নি। মুসলমানীয় রীতিনীতি কায়দা কানুন নিয়ম করে পালন করার পর ওরা একদিন পরিষ্কার বুঝল জাতে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। তাই শারিবার কাছে ইয়াছিনের খেদোক্তি—

"বাপ যেমন ছিলাম তেমনি আছি। তোর চাপই

ঠিক বলেছিল, হামরা পাখমারা আর বাদিয়া মোসলমানেরা মতোই বেজাত মোছলমান হোই গেলাম।

— বেজাত মোছলমান!

— হ্যাঁ! হাজী সাহেব কহেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, মোছলমানের কিরাকাম মানো, হাদিস মানো, তবিই তুমু সাচ্চা মুসলমান হবা। জাতে উঠবা। তা বাপ, সবই তো করি, কেন্তু জাতে তো উঠি না!

— জাতে উঠেন না!

— না বাপ, বেটিগুলার বিহা হয় না। মোছলমান হয়া হামাদের ঘর তো ফের কমি গেল।

— হাজী সাহেবরা একসাম ওঠবস করেন না?

— নামাজ পড়া যদি একসাথ ওঠবস হয়, তো সিটা করে, আর কেছু লয়।"[১১]

শত শত বৎসর অতিবাহী বাজিকর সম্প্রদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসে আপন অস্তিত্বকে সনাক্তকরণের যে নিঃশ্বেষ প্রক্রিয়া চলছে সেখানে ওদের জন্য আত্মবিলাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

উপন্যাস কথাসাহিত্যে নায়ক আমরা সাধারণত খুঁজে থাকি৷ 'রহুচণ্ডালের হাঁড়' উপন্যাসে নায়ক পাওয়া গেলো তা কিন্তু চোখের জলে, নাকের জলে গলে-যাওয়া মাংসপিণ্ডের প্রধান চরিত্র নয়, খটখটে হাড্ডির নায়ককে এখানে বেশ হাড়ে হাড়ে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এই নায়ক কোনো একজন ব্যক্তি নয়— সে একবচন নয়। সে হল বহুবচন। তাহলে তার নাম কী?

— নাম বাজিকর। বাজিকর একটা গোষ্ঠী।

— নিবাস?

— তামাম দুনিয়া।

ঘর-দোর, সমাজ, সংসার, ধর্ম নেই বলে দুনিয়া জুড়ে তার নিবাস। এই বাজিকর সম্প্রদায় যাদের নিজস্ব কোনো পরিচিতি নেই তারা এই উপন্যাসের নায়ক৷ ঘর ভূমিকম্পে হারাবার পর থেকে তারা ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে দিনের পর দিন। কোনো এককালে তারা ছিল গোরখপুরে। ভূমিকম্পে সেখান থেকে উৎঘাত হয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়েছিল রাজমহল। সেখান থেকে মণিহারি হাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, হয়ে মালদা। পূবের দিকে তাদের যাত্রা। পূর্বদিকে সূর্য ওঠে, তাদের পূর্বপুরুষ বলেছিলো পূর্বদিকেই তারা যাতে ঠাঁই নেয়। তাই তারা মালদা হয়ে রাজশাহী তারপর পাঁচবিবি। সেখানে মার খেয়ে আবার পশ্চিমের দিকে ফিরে যায়। ঘর তাদের নেই কিন্তু তাদের গন্তব্য আছে। গন্তব্য পূবের দেশে রহুর অস্থি অর্থাৎ স্থিতি, স্থায়িত্ব। কিন্তু বাজিকরদের নিজের দেশ নিজেই তৈরি করে নিতে হবে। নাম-ঠিকানাহীন বাজিকরদের ধর্ম কী? জাত কী? এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর বাজিকরের নেই। নিজের ধর্ম যে কী তা তাদের জানা নেই। প্রচলিত ধর্মগুলির কোনোটিকেই তারা সচেতন ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এর ফলে বাজিকর নিশ্চিত কোনো আধার পায়নি, যাতে করে আল্লা বা ভগবান এর উপর সমস্ত কিছু ন্যস্ত করে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। বাজিকরের ভাষা কী? এর ভাষা নিজের নয়। নদীর মতো যে স্থান দিয়ে বয়ে চলে সে স্থানের ভাষা আপন করে নেয়। মূল থেকে উৎখাত হওয়া এই গোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়। তারা যে ভাষায় কথা বলে নিজেদের মনে ভাব বিনিময় করে তাকে বুলি বলা যেতে পারে। তারা যেখান দিয়ে বয়ে ভেসে চলে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার বুলি জিভে আয়ত্ত করে নেয়। অভিযোজনের ক্ষমতা এদের অসাধারণ। আবার এরা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতেও পারে না। কোনো এক জায়গার

বুলি- মুখের ভাষার রূপ নেওয়ার আগেই তারা স্থান বদল করে। দেখতে দেখতে বাজিকর ভিনস্থানে চলে যায়, আবার অন্যবুলি রপ্ত করে।

'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের অভিশপ্ত এই গৃহহীন, ভূমিহীন, জাতমুক্ত, ধর্মমুক্ত বাজিকর গোষ্ঠী একটি স্থায়ী ঠিকানার খোঁজে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দেড় শতাব্দী ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়, এক নদী পেরিয়ে অন্য নদীর তীরে, পাহাড় পাড়ি দিয়ে আরেক পাহাড়ের উপত্যকায় তাঁবু ফেলে, জমি পেলে লাঙল চষে, মাঠের জন্তু জানোয়ার পোষ মানায়, গৃহস্থের পশুও চুরি করে তারা। কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে আসন পেতে বসা তাদের কপালে নেই। পূর্বপুরুষদের পাপে নাম-ঠিকানাহীন মানুষ তারা।

বাজিকরদের নাম-ঠিকানাহীন, বেপরোয়া, অস্তিত্বের সংকটে মরণাপন্ন মানুষদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা, সাধ, এতটুকুও কমে নি। বরং বিনিময়ে তারা স্থায়িত্ব পেতে চেয়েছে। এদের সংগঠিত রাখার জন্য সাদামাটা আয়োজন করতো এদের দলের প্রবীন কোনো এক ব্যক্তি বা সর্দার। যার আদেশে-নির্দেশে গোটা সম্প্রদায় পরিচালিত হত। দনু, পীতেম, জামির নিজেদের লোকজন সম্বন্ধে এদের ভাবনা ও উদ্বেগ, দায়িত্ববোধ ও তাদের প্রতি মনোযোগ কোনো পয়গম্বরের চেয়ে কম নয়। কালে কালে অবতীর্ণ পয়গম্বর বা দেবদূত যেমন তাদের নিজস্ব কৌম বা সম্প্রদায়ের রক্ষা ও বিকাশ সম্বন্ধে সর্বদা ভাবনায় ব্যস্ত থাকত তেমনি দনু থেকে নিয়ে পীতেম, জামির, শারিবা নিজ সম্প্রদায়ে হিতের স্বার্থে অনেক কিছুই ভেবেছে ও করেছে। সর্বশক্তিমান দেব-দেবী এদের নেই। তারা রহুকেই তাদের সহায় বলে মনে করে। দেব-দেবী কি আল্লারসুলের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার কি সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকবে তার সুযোগ নেই বলে নিজেদের ভালমন্দ এদের নিজেদেরই ঠিক করতে হয়।

একদিকে যেমন অবাধ স্বাধীনতা অন্যদিকে তেমনি কঠিন দায়িত্ববোধ। স্থায়ী ঠিকানা পেতে হলে কঠিন সত্যের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পন করতে হয়। নিজস্বতা, স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে আর উপায় থাকে না। সমাজের মূল ধারার মানুষের মতোই থিতু হবার বাসনা এদের প্রবল, অথচ গোরখপুরের ভূমিকম্পে উৎখাত হওয়ার অনেক আগেই সুদূর অতীতেও এরা ছিল কোনো মরু এলাকার মানুষ। সেখানেও তারা যাযাবর হয়েই জীবনযাপন করেছে। এই যে দীর্ঘকাল ধরে তাদের পথ চলা তার একমাত্র লক্ষ্য হল স্থায়ী ঠিকানা পাওয়া। তারা চেয়েছে গৃহস্থ হতে; মোষ থাকবে, হাল লাঙল থাকবে, আর থাকবে জমি। পথে পথে দেব-দেবী যোগাড় করলেও কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। এরা একটা দলে বিভক্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কলমা পড়ে মুসলমান হলেও ভদ্রলোকের সাথে তাদের ব্যবধান থেকেই যায়। বৃহত্তর সমাজে মিশে যাওয়ার প্রচণ্ড অদম্য ইচ্ছা থেকেই তারা চড়া দাম দিতেও প্রস্তুত হয়। নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু মর্যাদা পায় না। প্রেম, কাম, ক্রোধ, ক্রিয়া, বাৎসল, ঈর্ষা, ক্ষোভ, সাধ ইত্যাদি এই উপন্যাসে এসেছে এক, একজন বাজিকরের মধ্যে দিয়ে; কিন্তু তা কখনোই আলাদা হয়ে থাকে নি। বাজিকর গোষ্ঠীর সাধারণ অনুভূতিতে মিশে গেছে।

ছিন্নমূল মানুষ সমাজের মূল ধারার সঙ্গে বিলীন হতে সচেষ্ট হয়। সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হতে শক্তি হারায়, স্বাধীনতা লোপ পায়। বাজিকরদের দীর্ঘ পথচলার পর তার ঘর পেলেও মর্যাদা পায়নি। 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের কাহিনি বিংশ শতকের ষাটের দশকে এসে ঠেকেছে। দেশ তখন স্বাধীনও বিভক্ত। রহুর আশ্চর্য স্বপ্নময় ধূসর আলো-আঁধারির জগৎ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। লেখক বলেন—

"শারিবার যখন বছর বারো বয়স, তখন নানি লুবিনীর সঙ্গে তার সখ্য গভীরতর হয়। ... লুবিনীর এক

অজ্ঞাত দেশের কথা বলে। সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক আর কি কমো। সি দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজেই বিসোরণ হোই গিছে, তোক আর কি সিখামে।"[১২]

পীতেম বাজিকর গোষ্ঠীর দলপতি। সে তার সম্প্রদায়কে নিয়ে পূর্বপুরুষদের নির্দেশে পূবের দিকে এগিয়ে চলে। অনির্দিষ্টের সন্ধানে স্থায়ী ঠিকানা পেতে বাজিকরের এই পথচলা। ইন্দো-ইরানীয় যাযাবর জনগোষ্ঠী এভাবেই মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিল! পীতেম দলপতি মনের এক সুপ্ত ইচ্ছায় বাসযোগ্য ভূমি, আবাদযোগ্য জমি খোঁজার চেষ্টা করে! পূর্বপুরুষ রহুর সাবধানবাণী সত্ত্বেও, তার উত্তরপুরুষ সমগ্র উপন্যাসে আশ্রয় খোঁজে। সমাজ চায়, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ। চায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ; চায় ধর্মীয় অবলম্বন। সমাজের মূল স্রোতের প্রতিবেশী হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

পীতেমের সঙ্গে ঘটনাচক্রে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নেতা লক্ষণের সঙ্গে পীতেমের একান্ত আলাপের পরিসর ঘটে। লক্ষণ জিজ্ঞাসা করে—

"তোমাদের কি জাত, সরদার! পীতেম বলে, আমরা বাজিকর জাত । লক্ষণ বলে— 'বাজিকর কোনো জাত নয়।' পীতেম বলে, 'হিন্দু মুসলমানের সমাজ আমাদের ডোম-চণ্ডালের জাত হিসেবে ধরে।"[১৩]

লক্ষণের সঙ্গে পীতেমের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। লক্ষণ জানায় সমাজ, সংসারের কথা, জমি-চাষ আবাদের কথা। আবেগে অবিভূত হয়ে অভিজিৎ জানান—

"পীতেম জানবে না আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই নক্ষত্র খচিত রাতে খোলা আকাশের নিচে লক্ষণ সোরেন

যে বীজ তার অভ্যন্তরে প্রোথিত করল, তার অধস্তন তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষে সে পল্লবিত হয়ে অনেক সমস্যা, আশা আকাঙ্খা এবং দুঃখের জন্ম দেবে।"[১৪]

উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতায়, স্থায়ীত্বের উত্তরণের নিরলস সংগ্রামের ইতিহাস এটি। লুবিনীই এই যাযাবর বাজিকর সম্প্রদায়ের উত্তরণের ইতিহাসের কথক চরিত্র। রহুর বংশধরদের তিন চার পুরুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সূত্রধর তিনিই। আখ্যানের পর আখ্যান জুড়ে যে ইতিহাস তৈরি হয় তার শ্রোতা শারিবা। উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাজিকর গোষ্ঠীর অবস্থানটি কোথায়। লেখক উত্তরবঙ্গের নিম্নবর্গের অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়, অন্ত্যেবাসী মানুষদের ইতিহাসের সূত্রধর লুবিনীর ভাবনাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন— সমস্যা ছিল পীতেমের, সমস্যা ছিল জামিরের, সমস্যা লুবিনীর, শারিবার, সমস্যা কিছু বাজিকরের। রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি। সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করতো জীবদ্দশায়। কিন্তু লুবিনী কিংবা কোনো বাজিকর তাকে ভগবান, আল্লা ইত্যাদির সমগোত্রীয় ভাবতে তার শুধু ভয় নয়, অনিচ্ছাও বটে। কাজেই তার বোধের মধ্যেও রহু বেঁচে থাকে এক মঙ্গলাকাঙ্খী দলপতির মতো। তার ওপর সে দেবোত্ব আরোপ করতে পারে না। কারণ দেবোত্ব আরোপ করার সামাজিক স্থিতি আর নেই। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি কেন্দ্রিক উৎপাদন সম্পর্ক পীতেমের অজানা নয়। যদিও সাঁওতাল লক্ষণ সোরেন বলে—

"পুরুষমানুষের যেমন একজন মেয়েমানুষ চাইই, তেমনি সব মানুষেরই জমিও চাই।"[১৫]

জমিতে চাষ আবাদ সম্পর্কে পীতেমের সংশয় থাকেই। সে প্রশ্ন করে লক্ষণকে জমি থেকে তোমরা যে ফসল উৎপাদন করো, তার ওপর ক'জন খাবলা মারে। উত্তরে লক্ষণ বলে—

"ওঃ তার কি হিসাব আছে? যেমন ধরো জোতদার, গাঁতিদার, পওনিদার, ঘাটোয়াল, জমিদার, সাহেবপুলিশ, দারোগা, ব্রাহ্মণ আড়তদার, গোলদার মহাজন ... ইত্যাদি।"[১৬]

বাজিকর গোষ্ঠীর ভূমি সম্পর্কে 'থিতু' হওয়ার উদ্যোগ মধ্যস্বত্বভোগীদের অন্যায় শোষণের পরিচিত ছকে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সে খাস জমির ভোগদখল প্রসঙ্গই হোক আর আধিয়ারদের উপর জোর করে, জুলুম করে দাসখত নেওয়ার ক্ষেত্রেই হোক। তথাকথিত হিন্দু সমাজ কোনো সময়েই আদিম জনগোষ্ঠীর কৃষিজমির উপর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। সাঁওতাল, চোল, মুণ্ডা, শবর, হো সকল নিম্নবর্গীয় অন্ত্যেবাসী নিরীহ মানুষগুলো আজ অরণ্যে নির্বাসিত। ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের একটা অসম যুদ্ধ অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা আমরা জানি। তেমনি সাঁওতাল বাজিকরদের আদিপুরুষ 'রহু' ও অসম যুদ্ধে পরাজিত। কিন্তু যে পরাজয় গ্লানিময় হলেও সেখান থেকেই 'মিথ' এর সৃষ্টি। আর এখান থেকেই বাজিকর পেয়েছে আত্মবিশ্বাসের ইন্ধন—

"রহুর ক্ষত থেকে জলস্তম্ভের মতো উচ্ছ্বত হতে লাগলো রক্ত এবং সেই রক্তে প্রবল বন্যায় নদী উঠল ফেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী, দলত্যাগীদের ভূখণ্ড সব গ্রাস করে ধ্বংস করল। কেবল রহুর অনুগামীরা তার দেহকে আশ্রয় করে ভেসে যেতে থাকে দূর-দূরান্তে। তারা রহুর দেহের অস্থি কয়খানি আশ্রয় করে নতুন পথে পা বাড়ায়।"[১৭]

এক পবিত্র নদীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো বাজিকর। উচ্চবর্ণের মানুষ নিচুজাত, ধর্মহীন, অচ্ছ্যুত, বাজিকরকে নদীর জল ব্যবহার করতে দেবে

না। অথচ পীতেমের পিতা দনু বলে—

> *"পীতেম তেমন নদী কেউ দেখেনি, যে নদীতে তোমার পিতৃপুরুষ তৃষ্ণা মেটাতো। তেমন দেশ কেউ দেখেনি যে দেশে তোমার পিতৃপুরুষ বাস করত। তেমন জাত আর কোথাও নেই, যে জাতে তোমার জন্ম।"*[১৮]

চরম বাস্তব সত্যতার মুখোমুখি হয়ে বাজিকর রহু চণ্ডালের হাড়কে সম্বল করে তাদের ভাবনায়, চিন্তায়, চেতনায় 'ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা' অর্থাৎ মনের গহন গভীরে লুকানো ইচ্ছার বারবার মায়াবি কল্পনার রূপে প্রতিভাত হওয়া এবং তা পুরুষানুক্রমে বেঁচে থাকা। বাজিকর গোষ্ঠীর কয়েকজন জামির লড়াইতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়। দলপতি পীতেমের উপর নেমে আসে নির্মম পুলিশী নিপীড়ন। দারোগা সালমাকে ধর্ষণ করে, ফলে শুরু হয় নতুন এক আখ্যানের। সালমা আর পীতেমের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক অসহায় ভাবে লালিত হয়েছে। উভয়েই উভয়কে প্রচণ্ড ভালবাসলেও সম্পর্কের আবদ্ধে বাধা পড়তে পারছে না। সেখানে সভ্য সমাজ এর মানুষের কাছে সালমার ধর্ষণ বাজিকর জনগোষ্ঠীকে আরো অসহায় করে তোলে।

অত্যাচারী অমানবিক দারোগার ছেলে আনন্দর সঙ্গে বাজিকর মেয়ে পেমার প্রেমে পড়া উপন্যাসে বাজিকর জনগোষ্ঠীর জীবনে অন্য এক দুর্বিষহ যাত্রা এনে দেয়। পেমা আনন্দের কাছে রক্ষিতা হয়ে থেকে যায়। নেশা কেটে গেলে অর্থাৎ যাকে বলে মন ভরে গেলে আনন্দ নতুন রক্ষিতা আনে, পেমা বিতাড়িত হয়। অপমানে ক্ষোভে, দুঃখে পেমা আনন্দকে খুন করে। থানায় বন্দিনী গর্ভবতী পেমা গণধর্ষণের শিকার হয়ে বিভৎস অনিবার্য মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। একের পর এক দুঃখ ভরা কাহিনি, অন্তরের বেদনা, বিচ্ছেদ, না পাওয়ার বেদনা, কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর অদম্য ইচ্ছা, কাহিনির মধ্যেকার

কাহিনি, পার্শ্বকাহিনি উপন্যাসটিকে বহুকৌণিক মাত্রা দিয়েছে। জামির শক্ত সামর্থ্য বাজিকর গোয়ালাদের মেয়ে রাধার প্রেমে পড়ে, শুরু হয় নতুন এক বৃত্ত। বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে জামির মার খায়। ঝালোদের ঘরের মেয়ের সঙ্গে বাজিকরের প্রেম ও বিবাহ ও শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক পরিণতি দাঁড়ায়। নমোশূদ্র সমাজের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বাজিকর ইয়াসিনের সঙ্গে। ইয়াসিন জানতো নমোশূদ্র উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে বেজাত। সে নমোশূদ্রদের দলপতি ভায়রোর কাছে কাতর আবেদন করে— তাদের জাতে তুলে নেওয়ার জন্য, কিন্তু তথাকথিত সমাজ তার স্বীকৃতি দেয় না।

গ্রাম সমাজে জাতপাতের ভাগাভাগি, ছিন্নমূল বাজিকরের বেঁচে থাকার লড়াই, জাতীয় পরিচিতি পাওয়ার অদম্য ইচ্ছা, ধর্মীয় ও সামাজিক স্থিতি চাওয়া ও না পাওয়া ইত্যাদি আগোছালো ব্যথার এক পূর্ণাঙ্গ দলিল এই 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাস। অভিজিৎ সেন উত্তর বাংলার বিশেষত উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এছাড়া কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে পরিষ্কার বাস্তব তথ্যচিত্র তুলে ধরেছেন। গোপ-সদগোপ, ঝালো-মালো, নমোশূদ্র, বাজিকর, মুসলমান সমাজেও সম্প্রদায়গত বিভাজনের ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস।

অভিজিৎ সেন তার দক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাজিকরদের ধর্মান্তরিত হওয়ায় আখ্যানটি বর্ণনা করেন। কিভাবে বাজিকর স্থিতি পাবার আশায়, সমাজের মূলস্রোতে ফেরার আশায়, যে কোনো ধর্ম অবলম্বন করে সমাজে পরিচিতি পেতে চায়, তারই ইতিবৃত্তান্ত তিনি দেখিয়েছেন 'রহুচণ্ডালের হাড়' নামক উপন্যাসে। বাজিকর হানিফ রোড রোলার চালায়। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হানিফ বাজিকরদের মেয়েকে ভালবাসে। উপন্যাসের মূল কথক চরিত্রের লুবিনীর একমাত্র শ্রোতা যাদুকরী শারিবা হানিফকে বলে—

"বাজিকর যবে থিকা থিতু হওয়ার বাসনা করল,

তবে থিকায় সে সমাজের মানুষের কাছে আপন হবার চায়। কেউ তাকে আপন করে না। আজ যদি হাজি সাহেব তাক্ আপন করবা চাই, তো সি যাবে না।"[১৯]

বাস্তবিক সমস্যাকে অনুধাবন করে হানিফ বলে ওঠে—

"আমি তোমাদের মোছলমান হবার কথাতা ভাবতেছি। এতে কি বা লাভ হবে? কার লাভ হবে? হিঁদুরই বা কি লাভ? মোছলমানেরই বা কি লাভ? আর বাজিকরেরই বা কি লাভ?"[২০]

উপন্যাসের বাঁকে বাঁকে বহু ঘটনা, দুর্ঘটনা, ব্যথা, বেদনা, নিরাপত্তার অভাব, আশ্রয়হীনতা, জীবিকার জন্য বহুবিধ সংগ্রাম, প্রেম, যৌনতা, ধর্ষণ, সর্বোপরি ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচিতি পাওয়ার বহু আকাঙ্খিত ইচ্ছার প্রকাশ লক্ষ্য করি এই উপন্যাসে। তিন চার পুরুষের ইতিহাসের শেষে সামাজিক স্থিতি পাবার শেষ পর্বে শারিবা বলে—

"শয় শয় বছর চলি গেল। তা বাদে দুনিয়ার রাস্তা একদিন শ্যাস হয়্যা গেল। রাস্তাৎ আর সুখ নাই, স্বস্তি নাই। পথে বিপদ আগেও আছিল, বাদে তা হলো সীমাছাড়া। সমাজের মান্‌ষে নানা কারণে বাজিকর বাদিয়াকে ছিড়া খায়। তাই কারণে তিন চার পুরুষ ধরে হামরা থিতু হবার চাছি। কিন্তু থিতু হবার চালেই বাজিকর থিতু হবার পারে না। কারণ কি, তার যি ধরম নাই।"[২১]

অভিজিৎ সেনের ধ্রুপদী উপন্যাস 'রহুচণ্ডালের হাড়' এর সমগ্র আখ্যানে

মূলত তিনটি কাহিনি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথম— রহুচণ্ডালের কাহিনি, আদিতম রহস্যময় কাহিনি। দ্বিতীয়ত— যাযাবর বাজিকরের মাটির সংস্পর্শে এসে গৃহস্থ হওয়ার কাহিনি। তৃতীয়ত— একদল আত্মপরিচয় হীন ভবঘুরে মানুষের আত্মপরিচয় পাওয়ার কাহিনি। এখানে একটি সম্প্রদায়ের তিনটি বিন্দুর একটি সরলরেখায় মিলন ঘটেছে। প্রথম কাহিনিটি পৌরাণিক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক, তৃতীয়টি সামাজিক৷ তিনটি স্তরের বিস্তৃত বাস্তবতা তৈরি করেছে এক জটিল আবহ-আবর্ত৷

প্রথম আখ্যানেই আমরা দেখি 'রহুচণ্ডাল' এক পৌরাণিক চরিত্র। এই রহুচণ্ডালের পরিচিতি কি? সে বাজিকর গোষ্ঠীর আদিম পূর্বপুরুষ। বাজিকর সম্প্রদায়ের মূল আধার, আদি পিতা হল এই রহু। রহু তার দল বল, সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়ে এমন এক ভূখণ্ডে বাস করত জীবন ছিল নদীর মতো, নদীতে ছিল অফুরন্ত স্রোত, বনে অসংখ্য শিকারের পশু এবং মাঠে, মাঠভরা শস্য। মানুষেরা ছিল স্বাধীন, সুখী ও নিরাপদ। এক সময় বাজিকরের সেই সুখের বসতিতে বহিরাগতদের আগমন ঘটলো। তারা লোক-লস্কর বহর নিয়ে পবিত্র সেই নদীর তীরে ডেরা বসাল। ধীরে ধীরে দেবতার মন্দির নির্মাণ করল। ফেরার পথে তারা রহুর জনপদকে তারা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিল, ফসল নষ্ট করেছিল, রমণীদের ধর্ষণ করেছিল এবং যারা তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে হত্যা করেছিল। রহু তাদের কোনো বাধা দিতে পারলো না। আরো বলশালী হয়ে তারা যখন এল তখন তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি রহুর ছিল না। বহিরাগতরা এবার নিয়ে এল পুরোহিত, মন্দিরে তাদের দেবতা স্থাপন করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধগুলিকেও প্রতিষ্ঠা করলো। রহুর সম্প্রদায়ের সম্পদ, ফসল, পশু, এছাড়া রমণীদেরও তারা বল প্রয়োগের দ্বারা একরকম দখল করে নেয়। একসময় রহু আবিষ্কার করল, বহিরাগত থেকে আগত লোকজনের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি, তার

নিজ গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করেছে। রহু তার গোষ্ঠীর সদস্যদের ডাকল এবং তাদের কাছে স্বীকার করলে সে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। বহিরাগতরা তাদেরকে অন্ত্যজ ও ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তাদের পবিত্র নদীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেছে। এই অপমান ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রহু প্রাচীন অধিকার ও সমৃদ্ধিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলো। গোষ্ঠীর এক অংশ তাকে অনুসরণ করলো, অন্যেরা দূরে থেকে নিষ্ক্রিয় থাকল। রহু নদীকে পুনরায় উদ্ধার করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চললো। বহিরাগত সৈনিকেরা তাদের পথ আটকালো। প্রথমদিনের আগত বহিরাগত ব্যক্তি পুরুষটি খড়গাঘাত করল রহুর বুকে৷ তার দেহ ছিটকে পড়লো সেই পবিত্র নদীতেই। রহুল অনুগামীরা তার দেহকে রক্ষা করার জন্য প্রচণ্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই নদীতেই। রহুর বুকের ক্ষত থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগলো স্ফিত জলের মতো। নদী উঠল ফেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী, দলত্যাগীদের ভূখণ্ড সব গ্রাস করে ধ্বংস করলো। অবশেষে জলের বেগ কমল, রহুর অনুগামীরা তীর খুঁজে পেল এবং রহুর অস্থি কয়খানি নিয়ে নতুন পথে অজানা উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো।

রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি৷ সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, এক সম্প্রদায়ের নীতি নির্ধারণ করত জীবদ্দশায়। সে একটি সম্প্রদায়ের বা জাতির সর্বশক্তিমান নীতি নির্ধারক ব্যক্তি যার তাদের সেই সম্প্রদায় পরিচালিত হয়। সে আল্লা, ভগবান, যিশুর মতো সমগোত্রীয় সর্বজনীন ঈশ্বর নয়। তার উপর দেবোত্ব আরোপ করা যায় না। সে বেঁচে থাকে এক মঙ্গলাকাঙক্ষী দলপতির মতো। কারণ রহুর উপর দেবত্ব আরোপ করতে পারার মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অবলম্বন বাজিকরের নেই। সমাজচ্যুত, ভ্রাম্যমান, অসহায় বাজিকরদের রহু দেখে, এবং তাদের মঙ্গল চায়। সে চায় বাজিকর থিতু হোক গেরস্থ হোক৷ বাজিকর জানে জমিই হচ্ছে স্থিতি৷ দৈহিক মানসিক সামাজিক স্থিতি চায় বাজিকর। পৌরাণিক রহুর বিষয়বস্তু থেকে আমরা রহুর সম্প্রদায়ে

পবিত্রতা ও তার অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারি।

বাজিকর সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পুরুষ দনু। এই দনুর বংশধরেরা মৃত্যুর আগে রহুকে প্রত্যক্ষ করে। শেষ পর্যন্ত রহু তাদের সন্তুষ্ট করে। পীতেম প্রসন্ন রহুকে দেখেছিলো, আর জামির দেখে বিষন্ন রহুকে৷ মরার আগে লুবিনীও রহুকে দেখেছিল। বাজিকর বিপদে পড়লেই রহুচণ্ডালের হাড়ে তেল-সিঁদুর লাগায় আর তারপর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মনোরঞ্জনের পেশাকেই আপন করে নেই। কিন্তু আসল রহুচণ্ডালের হাড় কোথায় রয়েছে? বাজিকর জানে রহুর হাড় কোনো এক ভূখণ্ডে লুকিয়ে রয়েছে। আর সেই ভূ-খণ্ড থেকে সেই যাদু দণ্ড রহুচণ্ডালের হাড়কে খুঁজে বার করার জন্যই বাজিকরদের অফুরন্ত পথ চলা। তার সমস্ত স্থিতি, স্থায়িত্ব, স্বস্তি ও শান্তি হবে সেই ভূখণ্ডে৷ সব বাজিকর নিজস্ব সাধ্যমতো সেই হাড় খোঁজে। পীতেম থেকে শারিবা পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় একশো বছর ধরে তারা এই হাড়ের খোঁজে ভূ-পরিভ্রমণ করেছে। রহু যেন বাজিকরদের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। ছায়ার মধ্যে রহুকে তারা কল্পনা করে এবং ছায়ার সঙ্গে মিশে রহু দেখে কবে বাজিকরের পথ চলা শেষ হয়। রহু তার হাড় দিয়েছিল বাজিকরকে, যার মধ্যে দিয়ে সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে। রহু বাজিকরের রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা। বাজিকরদের নতুন ভূখণ্ডে স্থিতি না দিয়ে রহুর শান্তি নেই, মুক্তও নেই। আর এভাবেই 'রহু' আর 'স্থিতি' শব্দদুটি তাদের কাছে সমার্থক হয়ে যায়। আসলে রহুচণ্ডালের হাড় খোঁজা একটা রূপক৷ তারা রহুর হাড় এর অর্থে স্থিতিকেই খোঁজে। বাজিকর সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত স্থিতি পায় কিন্তু বাজিকর হয়ে নয়। ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে তারা হিন্দুয়ানীতে, মুসলমানিতে বিভক্ত হয়ে যায়। রহুকে তারা ভুলে যায়। শারিবাও সিদ্ধান্ত নেয় সে আর রহুচণ্ডালের হাড় খুঁজবে না। কারণ তারা স্থিতি পেয়ে গেছে। শারিবা নিজের কাছে প্রশ্ন রাখে— তবে কি রহু তৃপ্ত হয়েছে? সে এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারে না। কারণ রহু শুধুমাত্র তাদের পূর্বপুরুষ নয়, তাদের আত্মপরিচয়। এই আত্মপরিচয়কে হারিয়ে যে স্থিতি তারা পায়, সেই স্থায়ী ঠিকানার খোঁজেই তার

পথের পর পথ চলছিল কিনা তা শারিবা পরিষ্কার হতে পারে নি।

ঐতিহাসিক আখ্যানে আমরা দেখি বাদিয়া বাজিকরেরা স্থিতির খোঁজে একশো বছর ধরে ভূ-পরিক্রমণের পথে এগিয়ে চলেছে। গোরখপুরের আরো পশ্চিমে কোন এক মরুভূমি এলাকায় ছিল এই বাজিকরদের আদি নিবাস। সেখানে 'ঘর্ঘরা' নামে এক নদী বয়ে গেছে, পবিত্র নদী। এক শনিবারের ভূমিকম্পে ঘর্ঘরার বিশাল এক তীরভূমি বসে গিয়ে নদী গর্ভের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। পশ্চিমের ভীতি বাজিকরের কাছে ভয়ানক ও মারাত্মক৷ তাই তারা সর্বদা পূবের দিকে এগিয়ে চলেছে। পীতেম তার দলবল নিয়ে শেষবারের মতো গোরখপুর ত্যাগ করে মরা বাপ দনুর নির্দেশে পূবের দিকে, পূবের দেশে আসে। রাজমহলের গঙ্গার ধারে বাজিকরের ছাউনি পড়ে৷ সারি সারি ছাউনি। সেখানে পুলিস, মহাজন, শুঁড়ি, কয়াল, দোকানদার, মোদক, দালাল, সাহেব সব মিলে একটা ব্যাপক লুঠের বন্দোবস্ত। পীতেমের দল সেখানে বাঁদর, ভাল্লুক নাচিয়ে খেলা দেখায়। রহুচণ্ডালের হাড়ের ভেলকি দেখায়। বাঁশবাজি, দড়িবাজি, ভানমতির খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। তুকতাক, জড়িবুটি, হাত সাফাই করে। পীতেমের দুই ছেলে ধন্দু ও পরতাপ, আর এক মেয়ে পেমা। পীতেম জমির স্বপ্ন দেখে, স্থায়ী গেরস্থ হবার কথা ভাবে। বাজিকর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটি নিয়ে সে সর্বদা চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকে৷ কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া যাবে এই চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এই সময় সাঁওতাল পরগণার লক্ষণ সোরেনের সঙ্গে পীতেমের সাক্ষাত হয়। লক্ষণ সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে। কেমন করে জমিতে ফসল উঠার পর জমিদার, ঘাটোয়াল, পওনিদার, দারোগা, পুলিশ, ব্রাহ্মণ, আড়তদার, মহাজন প্রমুখেরা ছোবল মারে। কিভাবে মহাজন মালিকের শোষণে সাঁওতালরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। তবুও জমিতে চাষ করার সুখ, ফসল তোলার সুখের বীজ, পীতেমের মনে গ্রথিত করে লক্ষণই।

রাজমহল পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলময় পাঁচ বিঘা জমির পওনি পেল পীতেম। তবে তা পয়সার বিনিময়ে। জমিদারের নায়েব শ্যামলাল মিশ্রের কাছে নগদ টাকায় চাষিরা পাট্টা কেনে। পরে জানা যায় ওই পাট্টা সব ভূয়ো পাট্টা। ওতে জমিদারের দস্তখত নেই, নায়েবেরও নেই। হাজার হাজার দরিদ্র কৃষকের সঙ্গে এভাবেই প্রতারণা করে নায়েব। এই প্রতারণার ঘটনায় পীতেম দমে যায়। কারণ নগদ অর্থ দিয়ে পীতেম জমি পাট্টা করেছে। স্বপ্ন দেখেছে স্থিতি হওয়ার। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হয়। এদিকে লক্ষণ সোরেনকে দারোগা হাতকড়া, শেকল পরিয়ে জনগণের মধ্যে থেকে নিয়ে যায়। লক্ষণই ছিল গ্রামের এমন একজন সমঝদার মানুষ যে কিনা ওজন ও পয়সার হিসাব বুঝতে শেখে। তাই জমিদার, নায়েব, দারোগার চোখে পড়ে ও গ্রেপ্তার হয়। আর লক্ষণ জানতেই পারলো না, তার অজান্তেই তার ধান, চাল, গরু, শেষ সব ক্রোক হয়ে গেল। লক্ষণের পাশাপাশি সুফল মুর্মুও তাদের অত্যাচারের শিকার হয়। পাঁচটাকা কর্জ নিয়ে ধার শুধতে না পেরে মহাজন দয়ারামের কাছে বেগার খেটেছে মঙ্গল মুর্মু। এখন দশবছর ধরে খাটছে মঙ্গলের ছেলে সুফল। জোয়ান ও বিষন্ন সুফলের ঘাড়ের উপর পা দিয়ে ঘোড়ায় উঠে আড় হয়ে বসে দয়ারাম— এই ঘটনাকে নিয়ে কত বিষাদের গান রচিত হয়েছে। সুফল শেষে পালিয়ে যায় দয়ারামের ডেরা থেকে। জমিদার নায়েবদের অত্যাচারে দিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতালদের দমন করতে পাঁচ বাজিকরকে ইংরেজ সেনা হিসেবে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। যুদ্ধ হয়। পীতেমের ছেলে ধন্দু মারা যায়। পেমা আগেই মারা গেছে পীতেমের সন্তানদের মধ্যে এখন জীবিত শুধু পরতাপ। বাকি চার যুবক যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মালদা শহরে এসে তারা সাময়িক আশ্রয় নেয়। পনেরো বছর তারা পরের জমিতে অস্থায়ী বাসা বাঁধে। জমিদার 'বাদিউল ইসলাম' বাজিকরদের পাঁচ বিঘা জমি দেয় মালদা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে মহানন্দা ও টাঙ্গন নদীর সঙ্গমস্থলে জামিলাবাদের নমনকুড়ি গ্রামে। নমন কুড়িতে গিয়ে অপটু, অদম্য বাজিকরেরা পশুপালন ও চাষবাসকেই আপন করে নিলো।

নমনকুড়িতে গিয়ে নতুন চাষি বাজিকরও সাঁওতালদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জমি খালাসের কাজ করে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করেছিল। জমি, ফসল, চাষাবাদ, উৎপাদনের নেশা পরতাপকে পেয়ে বসে। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ তাকে মাতিয়ে তোলে। আর পীতেম এটা লক্ষ্য করে যে নেশার কথা সাঁওতাল লক্ষণ সোরেন তাকে বলেছিল। পরতাপ বুনো ধানের চাষ করে সমস্ত অঞ্চলের চাষিদের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়। পরতাপও জামির যখন মাথায় করে পাকা ফসলের বোঝা আনে, উঠোনে ফেলে সেই ধান স্নেহমাখা হাতে স্পর্শ করে, তার গন্ধ শোঁকে, নতুন ধান শিষ থেকে ছিঁড়ে দাঁতে কাটে। মাথায় পাগড়ী বাঁধা পরতাপকে তখন পুরোপুরি চাষি গেরস্থের মতো দেখায়। নমনকুড়িতে সাঁতবছর থাকার পর পীতেম অবশেষে মারা যায়। নমনকুড়িতে ভালো ফসল ফলে ধারাবাহিক ভাবে। কিন্তু বাদিউল ইসলামের ছেলে নতুন জমিদার জামাল বাজিকরদের উপর খাজনা বসায়। বাজিকর গোষ্ঠীর বসতিতে আচমকা আক্রমণ চলতে থাকে। সব ঝুপড়িগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, রমণীদের ধর্ষণ করা হয়। পরতাপের দুটি সন্তান আগুনে পুড়ে মারা যায়। এদিকে সরকারি নীতির পরিবর্তন হয়। ফলে আগেকার মতোই বর্ষায় নমনকুড়ি ডুবতে থাকে। পরতাপ, জামির দূরে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের জমি কোনটি তা দিক নির্ণয় করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তারা নমনকুড়ি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এমন একটি স্থান খোঁজার চেষ্টা করে যেখানে নমনকুড়ির মনে ফসল ফলবে কিন্তু জলে ডুবে সর্বনাশ হবে না। ধন্দুর ছেলে জামির, বালির ছেলে ইয়াসিন, জিল্লুর ছেলে সোজন হয়ে ওঠে বাজিকর দলের নেতৃবৃন্দে।

পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে বাজিকর এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে না, একথা পীতেম দলপতি বুঝেছিল। এখন দলপতি জামিরও তাই বোঝে। রাজশাহী শহরের বাইরে পদ্মানদীর ধারে তারা আশ্রয় নেয়। এখানেই রমজানের সঙ্গে জামিরের দেখা হয়। রমজানের সঙ্গে জামির তরমুজের চাষ করে। কয়েকটা

তরমুজ সে নিয়েও আসে বৃদ্ধ পরতাপের কাছে রাখে, তাকে দেখায়। পরদিন বৃদ্ধ পরতাপ সেই তরমুজের ক্ষেত দেখতে আসে, প্রাণ ভরে তার সুঘ্রাণও নেয়। নৌকায় করে তরমুজ নিয়ে জামির রমজানের সঙ্গে হাটে যায়। হাটে যাওয়ার পথে তারা নদীপথে আক্রান্ত হয়। তাদের পাঁচটি নৌকার মধ্যে তিনটি নৌকা জলে ডুবে যায়। জামিরের হাতে এক আক্রমণকারীর মৃত্যু হয় ফলে বিচারে জামিরের সাতবছর জেল হয়। ছিন্নভিন্ন বাজিকরেরা রাজশাহী শহরকে মূল বিন্দু করে সারা শহর জুড়ে তাদের যাযাবরী, বাজিকরী ব্যবসাকে নিয়ে দিনপাত করতে থাকে৷ জামির জেল ফেরত হবার পর রাজশাহী শহরের উত্তরে পাঁচবিবি নামে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে পাতালু নদীর তীরে বাজিকর নতুন বসতি স্থাপন করে। সেখানে হিন্দু জমিদার মহিমবাবু ও মুসলমান জমিদার লালমিয়া উভয়েরই কুঠিবাড়ি রয়েছে। লালমিয়ার পাটখেত নিড়াতে গিয়ে অজ্ঞানবশত বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। ফলে লালমিয়া জামিরকে পঁচিশ কোড়া মারে। সকলের হয়েই জামির মার খায়। জামির জানে অজানা, অপটু হাত হঠাৎ করে কাজ শিখতে পারবে না। এমনি করে মার খেতে খেতেই শিখবে। স্থিতি পাবার অদম্য ইচ্ছা থেকেই সমস্ত যন্ত্রণা জামির সহ্য করে আসছে। জামির বাজিকরের ভিখ-মাঙার কাজকে ঘৃণা করে। জামির চাইছিল চাষি গেরস্থ হতে, যার নিজের, ভঁইস থাকবে, হাল লাঙল থাকবে, ভুঁই থাকবে। কিন্তু বাজিকর মার খায়, চুরির দায়ে ধরা পড়ে, জেলে যায়, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, জমিদারের হাতি এসে ঘরদোর ভেঙে দিয়ে যায়। তবু জামির পাঁচবিবি নদীর চর আঁকড়ে পড়ে থাকে। এদিকে ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটে৷ দেশভাগ এগিয়ে আসে। তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়। তেভাগে অর্থাৎ তিনভাগে বিভক্ত হয় বাংলাদেশ। মহিমবাবু ও লালমিয়া বাজিকরদের দিয়ে জঙ্গল ও বাঁশবন পরিষ্কার করায়। দু-বছর ধরে বাজিকরেরা পরিষ্কার করা জমিতে চাষ-আবাদ করে চাষ বাস শিখতে থাকে৷ শিখেও নেই। পরের বছর জমিতে ভাদুই ধান হেসে খেলে ওঠে। কিন্তু সেই ধান

কেটে তোলার আগেই ফসল বেহাত হয়ে যায়। বাজিকরদের আধি জমিগুলিও বেহাত হয়ে যায়। জোতদার দিগিন মণ্ডল সব আধি জমিগুলি কিনে নেয়। বাজিকরদের সঙ্গে সংঘাতে দিগিন মণ্ডলের একজন মানুষ খুন হলে দুই কুঠিবাড়ির দুই হাতি বাজিকরদের ঘর-বসতবাড়ি সব দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দেয়, ঘরে আগুন লাগায়, বাজিকরের রমণীদের ধর্ষণ করে। এভাবে এই ছিন্নমূল মানুষদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা সেখান থেকে পূর্বদিকে চল্লিশ মাইল সরে এসে পাতালুনদীর ধারে মোহর হাট খেলায়, তারা নতুন আস্তানা বানায়। ছয়মাস ধরে তারা এখানে প্রায় খোলা আকাশের নিচে থাকে৷ দেশভাগ হয়। পাঁচবিবি পড়ে পাকিস্তানে আর মোহর হাট খোলা ভারতে৷ তখন বাজিকরেরা ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দু-ধারে নতুন বাসা বাঁধে। নতুন বসতিতে ধীরে ধীরে তারা অভ্যস্ত হয়। নানাবিধ ছোট বড় ঘটনা প্রাত্যহিক জীবনের চেনা-অচেনা ছবি, জাতপাতের ভেদাভেদ আমরা লক্ষ্য করি বাজিকরের নতুন বসতিতেও। আজুরা মণ্ডল বাজিকরদের সহায়তায় পতিত জমি উদ্ধার করে। শারিবা এগিয়ে এবড়ো খেবড়ো পতিত জমিকে পরিশ্রম দিয়ে সমান করে তোলে। মোহর ও বাদা-কিসমত গ্রামের মাঝ বরাবর অংশে বাজিকরদের বাস। বাদা-কিসমৎ দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্যে বিভক্ত। বাদা অংশে নমোশূদ্রদের প্রাধান্য আর কিসমৎ অংশে মুসলমানদের। দুই গ্রামের মধ্যে ভৈরব মণ্ডল ওরফে ভায়রো সমাজের প্রভাবশালি শক্তিধর মানুষ। এলাকার বাইশ দিগর এর প্রধান সে। বাজিকর কিসমৎ ওমরের সঙ্গে নমোশূদ্র পাড়ার মেয়ে মালতী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলে। জাতিভেদ প্রথায় ভায়রো তা মেলে নেয়নি। অবশেষে ভায়রোর নির্দেশে ওমরকে খুন হতে হয়। প্রতিশোধে ভায়রোকেও খুন হতে হয়।

শারিবার সঙ্গে কিসমৎ সম্প্রদায়ের হাজী খেসের ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে৷ আজুরা বাজিকরদের বসতি উচ্ছেদ করে চলে যেতে বললে, তারা হাজীর শরণাপন্ন হয়। অবশেষে হাজীসাহেব ও এলাকার তহশিলদার এর সহযোগীতায়

তারা আশার আলো দেখতে পাই। তারা জানায় ওই জমিতে আর আজুরা মণ্ডলের কোনো অধিকার নাই। এই জমি এখন সরকারের। হাজী ও তহশিলদার সোনামিয়া বাজিকরদের মুসলমানধর্ম গ্রহণ করার বিনিময়ে তাদের জমি দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়। ফলে বাজিকরেরা জাত পাবে, ধর্ম পাবে, এছাড়া মুসলমান জোত-জমিদাররা বাজিকরদের আধি দেওয়ারও ব্যবস্থা করে। মহারথের দিন প্রায় বাজিকরই মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরীত হয়। হাজীসাহেবের নির্দেশমতো সোনামিয়া একগোছা কাগজ ইয়াসিনের হাতে দিয়ে বলে এখন থেকে এই বসত-জমি-ভিটার তুমিই মালিক৷ কেউ তোমাকে আর উচ্ছেদ করতে পারবে না। সরকারি এই কাগজের এমনই ক্ষমতা। কিন্তু পরিণতি আবার একই দাঁড়ায়, তারা গৃহহীন, ভূমিহীন, সমাজহীন অসহায় হয়ে থেকে যায়।

এক জমি সংক্রান্ত নিয়মে পরিবর্তন আসে। আধি জমি রেকর্ড হওয়ার কথা শোনা যায়। ফলে এখন আর আধি নয়। মুসলমানিতে ও হিন্দুয়ানিতে বিভক্ত হয়ে এইভাবে বাজিকরেরা স্থিতি পেতে চায়। এখন আর তাদের কেউ উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। তারা আর ভূমিহীন নয় একথা সব বাজিকরই বোঝে৷ বাজীকরি পেশায় আর কেউ পথে পথে ভিক্ষে করে যাযাবরের মতো নাম-ঠিকানাহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় না। এখন তাদের চোখে ভাঙাচোরা ঘর-দোরগুলিকে নিয়ে পীতেম থেকে শারিবা পর্যন্ত এই প্রায় শতবছরের বাজিকরের পথচলার পরে স্থিতি পাওয়ার ঐতিহাসিক আখ্যান স্তরটি শেষ হয়।

সামাজিক স্তরে এসে আমরা দেখি কীভাবে একদল আত্মপরিচয়হীন মানুষ শত বছর ধরে পথে চলতে চলতে, নানান সমস্যার, কষ্টের, অন্যায়ের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে রাষ্ট্রীয় আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। রহুচণ্ডাল ও তার পথে চলমান উত্তরসূরীদের অর্থাৎ বাজিকর বাদিয়া গোষ্ঠীর কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই, নির্দিষ্ট ইষ্ট দেবতা নেই, দেশও নেই। নিজস্ব আত্মপরিচয় দানের একটি অবলম্বনও তাদের কাছে নেই। এদের অবলম্বন শুধু একটাই রহু

চণ্ডালের মিথ এবং থিতু হওয়ার স্বপ্ন। মিথ-স্বপ্ন আর বিস্তৃতি এইসব নিয়েই বাজিকরের আত্মপরিচয়। বাজিকর ক্রমে বুঝতে পারছিলো সময় দ্রুত বদলাচ্ছে, অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। বাজিকরের এমন এক অস্তিত্ব যা দিয়ে ভালোবাসা যায় না, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, কৃষিকর্ম করে জমিতে ফসল ফলানো যায় না, সভ্য জায়গায় চাকরী পাওয়া যায় না। যাদের নিজের কোনো ঠিকানা নেই, তাদের মধ্যে আবার জাতিভেদের আগুন তীক্ষ্ণ। বাজিকর যুবক ওমর ও নমোশূদ্র পাড়ায় মালতীর প্রণয়ের পরিণতি ভয়াবহ হয়। নমোশূদ্রদের দলপতি ভায়রোর নির্দেশে ওমরকে হত্যা করা হয়। সোজন আর পাখির বিয়ে সমাজ মেনে নেয়নি, এই কারণে সোজন নষ্ট হয়ে হারিয়ে গেল। জমিতে ফলানো ফসল বাজিকর ঘরে তুলতে পারে না। ধর্মহীন মানুষেরা কাজ করার জায়গাও খুঁজে পায় না। শারিবা শহরে চাকরীর দরখাস্ত করে, ধর্মের জায়গায় লেখে 'বাজিকর'। দরখাস্ত লেখক জানায় ভারতবর্ষে এমন কোনো স্বীকৃত ধর্ম নেয়, তাই তার চাকরী হওয়া সম্ভব নয়। বাজিকর মুসলমানের মতো নামাজও পড়ে না, আবার হিন্দুর মতো পুজো অর্চনাও করে না। তারা গরু, শুয়োর সবই খায়। পেশাগত কাজ পথে চলা আর ভিখ মাঙা। বাজিকরের দেবদেবী যেমন— ওলামাই, কালিমাই, বিগামাই, হারুরানে, এইসব দেবদেবীরা পথেরই সংগ্রহ। অন্য সমাজ তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। ধর্ম নেই, বেজাত, অচ্ছুৎ ইত্যাদি বলে বিদেয় করে দেয়। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা, অকালে মৃত্যু ইত্যাদির সংখ্যা বেড়েই চলে। বাজিকরের মেয়েকে কেউ ঘরের বউ করতে চায় না, বাজিকরের ছেলেকে কেউ জামাই করতে চায় না। দেশভাগ যতই এগিয়ে আসছিল জাত, ধর্ম, দেশ ইত্যাদি প্রশ্নগুলি আরো তীব্র ও সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। বিগত শতাধিক বছরে বাজিকরকে এই প্রশ্ন কেউ করেনি। কিন্তু পাঁচবিবির হিন্দু জমিদার মহিমবাবু ও মুসলমান জমিদার লালমিয়ার কাছে এই প্রশ্নটি জরুরী হয়ে ওঠে। বাদা-কিসমৎ গ্রামের ভায়রোর কাছেও প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিশাহারা বাজিকর নিজের দেশ খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু কোথায় বাজিকরের স্থিতি তা তারা জানে না। তারা পথ চলতে চলতে প্রতিবারই মনে হয়, তারা যেন তাদের দেশ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু হায় বারবারই তারা মানুষের দ্বারা বা প্রকৃতির বিপর্যয়ের দ্বারা উচ্ছেদ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে৷ এদিকে বাজিকর পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তারা আর সুখ খুঁজে পাচ্ছে না, রাস্তায় নিরাপত্তা নেই, মনে শান্তি নেই। সমাজভুক্ত মানুষেরা বাদিয়া বাজিকরদের লুটে-পুটে খায়। তারা বুঝতে পারে তাদেরও দেশ চাই, ধর্ম চাই, জাত চায়। তারা শেকড় মাটিতে ভেদ করে গভীরে পৌঁছতে চেষ্টা করে, থিতু হওয়ার জন্য কিন্তু শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে তাদের তথাকথিত সভ্য সমাজ। হানিফ রোড রোলার চালায়। যে রাস্তায় সে রোড রোলার চালাবার কাজ করে সেখানে এই সব ছিন্নমূল মানুষদের দেখে সে অবাক হয়। মানুষ অথচ মানুষের স্বাধীন ধর্ম, মৌলিকতা এদের মধ্যে নেই। আমরা দেখি ইয়াসিনের নেতৃত্বে অধিকাংশ বাজিকর মুসলমান হয়ে যায়। আবার রূপা, শরমীর মতো অনেকে বিষহরির পাঁচালি গান করে। এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েই অবশেষে তারা স্থিতি পাওয়ার চেষ্টা করে। ধর্মের আশ্রয়ে বাজিকরদের স্থিতি দিলেও স্থান দিতে পারে নি। কারণ হানিফ জানে সমাজে মূল বৈষম্য হল অর্থনৈতিক বৈষম্য। আর্থিক ভাবে দুর্বল বাজিকর সমাজে স্থান করতে সমর্থ হয় না। পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু-মুসলমান বাজিকরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় তারা যে দুর্ভোগের মধ্যেই ছিলো সে দুর্ভোগের মধ্যেই থেকে গেলো। অসহায় অচ্ছুৎ বাজিকর হিসেবেই তারা সমাজের মধ্যে গণ্য হতে লাগলো। মুসলমান হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাজিকরের গান থেকে 'বেজাত' নামের তকমাটা যায় না। বেজাত মুসলমান নামেই তারা আলাদা হয়েই থাকে৷ তাদের মেয়েগুলোর বিয়ে হয় না। আর ভায়রো পরিষ্কার জানিয়ে দেয় কেউ হিন্দু হয়ে জন্মাতে পারে, হিন্দু হতে পারে না। ফলে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেও রেজাত হিন্দু বাজিকর হয়েই থাকে৷ বাজিকর হিন্দু-মুসলমানিতে

বিভক্ত হয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। জামিরের ছেলে রূপা তাই অনুভব করে— আমরা হিন্দু-মুসলমান হতে পারিনি আমরা সেই বেজাত, অচ্ছ্যুত, বাদিয়া বাজিকরই থেকে গেছি। উপন্যাসের শেষে দেখি বাজিকরের মেয়ে পলবিকে বিয়ে করে হানিফ। শরিবা শহরে যায়। গ্যারেজ শ্রমিক হয়ে কাজ করে। ভিক্ষাবৃত্তি করা যাযাবর বাজিকর গেরস্থ হয়, আবার গেরস্থ-কৃষক গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে শ্রমিক হয়ে ওঠে। পেশাগত সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি তাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। বাজিকর যুবকেরা পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারা শহরে সিনেমা দেখতে যায়। নমোশূদ্র পাড়ায় মালতীকে শারিবা বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মালতীর প্রেমিক ওমর বাজিকর ভায়রোর হাতে খুন হয়। ওমরের ঔরসজাত সন্তান মালতীর গর্ভে। এই মালতী ও তার সন্তানকেই আপন করে নিতে চায় শারিবা। এভাবেই বহু বছরের সুদীর্ঘ পথচলা থেকে— পীতেম, জামির, লুবিনি, সোজন, ওমর শারিবার আশা-আকাঙক্ষা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। বাজিকর হিন্দু ও মুসলমান সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে শুরু করে ধীরে ধীরে। তারা জাত পায়, ধর্ম পায়, আত্মপরিচয় পায়, দেশ পায়, স্থিতি পায়। রেশনকার্ড, চিনি, কেরোসিন, এইসব সরকার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় তারা অংশীদার হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান, আল্লা-বিষহরি, ভোটের রাজনীতি, দলাদলি ইত্যাদির ব্যস্ততার মধ্যে ধীরে ধীরে তারা রহুকে ভুলে যায়। অবহেলিত, উপেক্ষিত জীবন থেকে আজ তারা নিষ্কৃতি পায়। তারা খুঁজে পায় নিজেদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক পরিচয়। এইভাবে বিনির্মাণের পথে নিজের যাত্রা শুরু করে। নতুন আত্মপরিচয় পাওয়ার মধ্যে দিয়ে 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের সামাজিক আখ্যানটি শেষ হয়।

ভারতবর্ষে নারী ও পুরুষ, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ, হিন্দু ও মুসলমান সবারই অধিকার রয়েছে। নিম্নবর্গের ভারতবর্ষে, নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে স্বাধীন চেতনার উন্মেষ ঘটে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র ও সীমানা প্রসারিত হয়ে অন্ত্যজদের

ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে স্ব-ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়। ভারতীয় সাহিত্য শিল্পে যে অন্ত্যজ, অচ্ছ্যুৎ, হাঘরে সম্প্রদায় এতদিন বঞ্চিত ছিল তারাই আজ সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্রে এসে হাজির হয়েছে। ফলে একটা সময় হয়তো অর্থের সমবণ্টন হবে। সবাই শিক্ষার আওতায় আসবে। দেশ এরই সঙ্গে উন্নয়নের ধারায় প্রবাহিত হবে।

আধুনিক বিশ্বের তথা ভারতবর্ষে 'সাব-অল্টার্ন সাহিত্য' সাহিত্যের এক নতুন ধারা। ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্য চিন্তাধারায় বিশেষ জায়গা অধিকার করে নিয়েছে এই 'সাব-অলটার্ন' চিন্তাধারা। বাংলায় যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'নিম্নবর্গীয় চিন্তাধারা'। মুসোলিনীর কারাগারে বন্দী কমিউনিস্ট নেতা আনতোনিও গ্রামসি প্রথম ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্নবর্গীয় কথাটি ব্যবহার করেন। ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ আনতোনিও গ্রামসির এই মতাদর্শকে সামনে রেখে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার এক যুগান্তকারি সমালোচনা করলেন। ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক অবস্থান এবং কৃষক চেতনার বৈশিষ্ট্যতা এই দুটি বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। সাধারণ বা আমজনতার রাজনৈতিক চাহিদাকে কোনোদিনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কৃষক অভ্যুত্থানের মতো আন্দোলনকে উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায় বিরোধ বা বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ শব্দদুটিকে সর্বদা শাসক শ্রেণি ও শাসিত শ্রেণির প্রতিশব্দ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র্য বলেও পরাধীন থেকে যায়। এই স্বতন্ত্র্য চিন্তা কিন্তু পরাধীনতার কবল এই দ্বিধা-দ্বান্দ্বিকতা ও তা থেকে উত্তরণের রূপটিকে অবলম্বন করে নিম্নবর্গের আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের বিরোধীতা করা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য। নিম্নবর্গের সাহিত্য আলোচনায় নিম্নবর্গের দৃষ্টিকোণ দিয়েই দেশ-কাল-মাটি-মানুষকে বিচার করা হয়। এখানে নিম্নবর্গই মুখ্য, উচ্চবর্গ গৌণ। আমাদের

আলোচিত 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে আমরা নিম্নবর্গীয়দের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। বাজিকর সম্প্রদায়ের ইতিহাসের শুরুতে আমরা দেখি তারা ক্ষমতাহীন, অসহায়, অপারগ, প্রতিরোধে অক্ষম। রহু তার চোখের সামনে তার ভূখণ্ডে নয়া উপনিবেশ পত্তন হতে দেখে কিন্তু কোনো প্রতিশব্দ করতে পারে না। রহুর গোষ্ঠীর অসহায় হয়ে পড়ে৷ রহু তাদের রক্ষা করতে পারে না। বাজিকর পুরুষদের হত্যা করে ও রমণীদের ধর্ষণ করা হয়। বহিরাগত ঔপনিবেশিকেরা অত্যাচার বাড়িয়ে চলে। তারা দেবতার মন্দির স্থাপন করে ও তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করে। বাজিকর সম্প্রদায় নিজস্ব ভূমি হারায় ও পথে নামে। রহু লক্ষ করে বহিরাগতদের ভ্রষ্টাচার তার দলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অসহায় রহু কোনো প্রতিকার করতে পারে না। ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক, স্বাধীনতা ও স্বভূমি হারিয়ে রহু বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে নদীর জলে আত্মবিসর্জন দেয়।

অপসারিত বাজিকর গোষ্ঠী নিজেদের অপহৃত ভূ-খণ্ড ও স্বাধীনতা পুনুরুদ্ধার করতে পারে না। বিতাড়িত, ভ্রাম্যমান বাজিকর তাই একখণ্ড ভূমির খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পূর্বপুরুষ রহু, দুনুর নির্দেশে পূবের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে৷ কিন্তু স্থিতি পাওয়ার মতো ভূ-খণ্ড তারা কোথাও খুঁজে পায় না। সারা ভারতবর্ষের মাঠ, ঘাট, নদ-নদী, বনভূমি, প্রান্তর সবকিছু অধিকার করে বসে আসে, জাত, ধর্ম, সমাজ, বিদেশী উপনিবেশ, জমিদার, মহাজন, দারোগা, মাতব্বর, মোড়ল, ধর্মগুরু ও দেশীয় দূর্নীতিগ্রস্থ অভিভাবকরা। তাই বাজিকর গোষ্ঠী ভূমি খুঁজে পায় না। যেখানেই যায় সেখানেই তারা অন্ত্যজ, নিম্নবর্গ, অধীনস্থ, অচ্ছ্যুৎ। সমাজে তাদের স্থান নেই। সমাজ, ধর্ম, তাদের আপন করে না। বাজিকরে জাত নেই, ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই, তার মধ্যে হামিদ সত্য ও স্বচ্ছ ভারতবর্ষের ছবি দেখতে পায়। সে বলে, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত জাতি যদি বাজিকরের মতো বেজাত হয়ে যেতো, তবে সেটাই ভালো হতো। হামিদের এই

বক্তব্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদী একাগ্রতার চিন্তা কাজ করে। স্থিতি পাওয়ার লোভে বাজিকর কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরীত হয়ে ভাগাভাগি হয়ে যায়। এতে তারা ধর্ম পায়, জাত পায়, রাষ্ট্র পায়, সর্বোপরি স্থিতি পায় কিন্তু স্থান পায় না। তারা অচ্ছুৎ বাজিকর বলেই পরিগণিত হয়। মুসলমান হয়েও তারা বেজাত মুসলমান হয়ে থাকে, হিন্দু হয়েও তারা হিন্দু সমাজে বহিরাগত। অর্থনৈতিক ভাবে তারা সেই হাঘরে, নিরন্ন, নিম্নবর্গই হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তারা তাদের নিজস্ব আসল পরিচয় রহুর অনুগামী তারা তা ভুলে যেতে থাকে। বাজিকর সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় বড় ধরণের এক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। তারা নিজস্ব আত্মপরিচয় হারায়। নিম্নবর্গ হিসাবে বাজিকরের অর্থনৈতিক দূরবস্থার কোন হেরফের হয় না। প্রাক্-ঔপনিবেশিক অতীতের স্তর থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। স্বাধীন সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদায় এবং একটুকরো ভূখণ্ডের প্রত্যাশায় তারা দাসত্বকেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রোড রোলার ড্রাইভার হানিফ সেটা অনুভব করতে পেরেছিল তাই চরম বাস্তব কথা। কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই হল আসল স্বাধীনতা। ধর্ম-জাত-রাষ্ট্র-সমাজ ইত্যাদি একটা অবলম্বন মাত্র, এখানে অর্থনৈতিক শোষণ বৈষম্যই হল মূল কথা। আফ্রিকার কালো মানুষেরা বুঝেছিল, কালোরা ও কালোমানুষদের শোষণ করতে পারে। কারণ কালো মানুষদের সাহচর্য ও কৌশলছাড়া সাদা চামড়ার লোকেরা এতদিন ধরে তাদের পরাধীন করে রাখতে পারতো না। যেমনভাবে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝেছিল মুসলমান বাঙালিরা ও মুসলমান বাঙালিদের শোষণ করতে পারে। আর এই শোষণ ও শাসন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য নিজেদের হাতে স্বহাল ও বহাল রাখার জন্য। আসলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণিবৈষম্যই মূল কথা, যার দ্বারা শাসক ও শোষক নির্ধারণ করা হয়। আর ধর্ম-জাত-বর্ণ-সমাজ ইত্যাদি শুধু নামমাত্র। শেষ পর্যন্ত পিতেম ভাবে সে চায় স্থিতি যার অপর নাম অর্থ উপার্জন। অবশেষে বাজিকর স্থিতি পায়, কিন্তু নিম্নবর্গ হিসেবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের

কোনো পরিবর্তন হয় না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায় কিন্তু ঘরছাড়া, ভূমিহীন, অসহায়, নিরন্ন, মানুষেরা কোনো পরিবর্তন দেখতে পায় না। রহু অর্থাৎ বাজিকরের আদি পিতা, আসলে যে স্বপ্ন দেখেছিল তা অধরাই থেকে গেলো।

উত্তর ঔপনিবেশিক কালে জটিল বাস্তবতার মধ্যে উচ্চবর্গের অভিভাবকদের হাতে নিম্নবর্গের মানুষদের শাসন ও শোষণের কাহিনি অন্যতম। সেখানে ব্যক্তি নয় সমষ্টি, একক স্বর নয় বহুস্বর, ইতিহাস নয় লোককথার মিথ মূল আলোচ্য বিষয়। অভিজিৎ সেন তাঁর 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে বলেন—

> *"সাধারণভাবে বলতে গেলে মিথ বা লোককথার বহুমাত্রিক ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে এখনো খুবই নতুন। সত্তর দশকের 'গ্রামে চলো' ব্যাপারটা অন্য অনেক কিছুর মতো শিল্প সাহিত্যেও একটা ওলোটপালট করেছে মনে হয়। .... ফলে অন্য মাধ্যমগুলোর মতো গল্প উপন্যাসেও একটা অবলম্বন আমরা খুঁজতে চেয়েছি যা ঠিক ইউরোপীয় নয়। ভারতবর্ষীয় মিথ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথার উপাদান পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তরবঙ্গের উপভাষা, এমনকি কোনও উপভাষার ঢঙে তৈরী কৃত্রিম বাক্‌রীতির ব্যবহার আজকাল লেখাতে আমরা করি। .... ইউরোপ নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের গল্প, উপন্যাস, কবিতার সঙ্গেই এই নতুন বিষয় ও রীতির মিল। লোককথা, লোকসঙ্গীত, এবং লোকশিল্পের সেই অবাধ শৈলী আমি আত্মস্ত করতে চাই যা দিয়ে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত সবাইকেই মুগ্ধ, বিস্মিত এবং প্লাবিত করা যায়। .... আধুনিক বাস্তবতার*

যতরকম রূপ আছে, তার সবকটির মধ্যেই গলাটিপে শ্বাসরুদ্ধ করে সুস্থ জীবনবোধকে ধ্বংস করার প্রবণতা আছে বলে অনেকের মতো আমারও মনে হয়। সুস্থ জীবনবোধ জাগ্রত করার জন্য মঙ্গলকাব্যের বাস্তবতা কিংবা লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করে নিয়ে আসতেই আমার এবং আমার মতো আরো অনেকেরই লক্ষ থাকবে। ... লোককথা, লোককথার ঢং, মিথের অলৌকিক বাস্তবতা এসবের মধ্যেই নতুন চিন্তা ও চেতনার সমাধান হয়তো পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে আমাদের সাহিত্যের বর্তমান বন্ধ্যাদশা হয়তো ঘুচাতে পারে।"[২২]

বাজিকরেরা স্থিতি পায় পূবের দেশে। এই পূবের দেশ তাদের কল্পনা প্রসূত। রহুচণ্ডালের বংশধরেরা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। রহুর নিঃশব্দ প্রেরণায় বাজিকর গোষ্ঠীর লোকেরা পূবের দিকে অজানা লক্ষ্যে পথ চলতে থাকে। অবশেষে তারা স্থিতি পায় বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। বাজিকর কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান হয়ে সমাজ ও ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই, এখানেই তাদের বিকল্প বাস্তবতা। সমাজে স্থান পেয়েও তারা অচ্ছ্যুৎ, অস্পৃশ্য, নিম্নবর্গই থেকে যায় অর্থনৈতিক দুরবস্থাজনিত কারণে। পরিচিতি ও স্থিতি পেয়েও তারা পায় না। অন্যদিকে তারা তাদের পূর্ব-পরিচিতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে। এই বিকল্প বাস্তবের বিকল্প গ্রন্থনার সত্য ও বাস্তবোচিত তথ্য আমাদের সামনে পরিবেশিত করেন অভিজিৎ সেন।

তথ্যসূত্র :

১. 'রহুচণ্ডালের হাড়', অভিজিৎ সেন, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ ০৫

২. তদেব, পৃঃ ০৬

৩. তদেব, পৃঃ ৮৬

৪. তদেব, পৃঃ ০৬

৫. তদেব, পৃঃ ১৮১-১৮২

৬. তদেব, পৃঃ ১৮১

৭. তদেব, পৃঃ ০৬

৮. তদেব, পৃঃ ০৯

৯. তদেব, পৃঃ ২০৮

১০. তদেব, পৃঃ ২০৮

১১. তদেব, পৃঃ ২৬২

১২. তদেব, পৃঃ ০৫

১৩. তদেব, পৃঃ ৩৩

১৪. তদেব, পৃঃ ৩৪

১৫. তদেব, পৃঃ ৩৩

১৬. তদেব, পৃঃ ৩৪

১৭. তদেব, পৃঃ ৭৭

১৮. তদেব, পৃঃ ৭৪

১৯. তদেব, পৃঃ ২৪৩

২০. তদেব, পৃঃ ২৪৩

২১. তদেব, পৃঃ ২৪৪

২২. 'রহুচণ্ডালের হাড় ও আখ্যানের তিন স্তর : একটি আলোচনা', রাহুল দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৩৪-১৩৫